

এবং প্রান্তিক

An International Research Referred Journal

DIIF Approved Impact Factor : 1.12

Issue 1st Vol.3rd May, 2014

সম্পাদক

আশিস রায়

E:\ebong prantik logo.tif

EBONG PRANTIK

Ebong Prantik

An International Research Referred Journal

Editorial Board

**Executive Editor**- Prof.Bratati Chakravarty.

**Editor-** Ashis Roy.

**Co-Editor**-Tumpa Bapari, Asish Kr.Sau, Sujay Sarkar.

**Expert Members**-

Dr.Alok Ranjan Dasgupta (Hedelberg University)

Dr.Achinta Chatterjee (California University)

Dr.Alokesh Dutta Roy (Scientist/Pharmaceuticals,Boston)

Dr.Manas Majumdar (Calcutta University)

Dr.Tarun Mukhopadhyay (Calcutta University)

Dr.Tania Hossain (Waseda University)

Dr.Soumitra Shekhar (Dhaka University)

Dr.Aloka Chatterjee (Banaras Hindu University)

Dr.Namita Bhattacharya (Banaras Hindu University)

Dr.Prakash Kumar Maiti (Banaras Hindu University)

Dr.Sumita Chatterjee (Banaras Hindu University)

Dr.Soumitra Basu (Rabindra Bharati University)

Dr.Srutinath Chakraborty (Vidyasagar University)

Dr.Samaresh Debnath (Dhaka University)

Dr.Bhuina Iqbal (Chattagram University)

Mr.Mrinmoy Paramanik (Research Scholar,Hydrabad University)

Mr.Md.Intaj Ali (Research Scholar,Hydrabad University)

প্রথম প্রকাশ : ১৩ই মে ২০১৪।

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ২রা মার্চ ২০১৫।

\* লেখার দায়িত্ব লেখকের নিজস্ব। সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই পত্রিকার কোন অংশের কোনরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।

সূচিপত্র

|  |  |
| --- | --- |
| সম্পাদক সুকুমার রায়/ড. ব্রততী চক্রবর্তী | ১-৯ |
| অন্যান্য দেশের জাতীয় সঙ্গীতের তুলনায় বাংলা দেশের জাতীয় সঙ্গীত/ ড. সৌমিত্র শেখর | ১০-১৭ |
| আশালতা সেন (১৮৯৪-১৯৮৬)/ড. নমিতা ভট্টাচার্য | ১৮-২৬ |
| **বিবেক-মানসে আদর্শ নারী : আজকের পরিপ্রেক্ষিতে**/ড. সুমিতা চট্টোপাধ্যায় | ২৭-৩২ |
| উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাটকে মদ্যপানের প্রভাব/টুম্পা ব্যাপারী | ৩৩-৩৯ |
| সৃষ্টির বিকল্প সন্ধান : শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ/মৃন্ময় প্রামাণিক | ৪০-৪৭ |
| রূপকথার ছদ্মবেশ ও বিশ্বসাহিত্য/ড. ঋতম মুখোপাধ্যায় | ৪৮-৬৪ |
| আধুনিকতা ও জীবনানন্দ দাশ/অমিত ধাড়া | ৬৫-৭১ |
| রবীন্দ্রনাথ ও স্বামীবিবেকানন্দ/আশীষকুমার সাউ | ৭২-৭৯ |
| রবীন্দ্র সাহিত্যে সন্ত চেতনা : বহুমুখী সৃষ্টির আর এক দিক/ড. সোমা দত্ত | ৮০-৮৭ |
| বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে লোকসংস্কৃতিঃ একটি সাধারণ পাঠ/ মনোজিৎ রায় | ৮৮-৯৬ |
| কালকূটের উপন্যাসে বাউল সঙ্গীত /শ্রীতম মজুমদার | ৯৭-১০৮ |
| প্রসঙ্গ ধর্মভাবনাঃ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ/ দেবব্রত গায়েন | ১০৯-১১৬ |
| রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীঃ সার্ধশতবার্ষিক স্মরণ /তন্ময় মণ্ডল | ১১৭-১২২ |
| শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পঃ মানবিকতার মূল্যবোধ /তুষার কান্তি মণ্ডল | ১২৩-১২৭ |
| কাজী নজরুলের চোখে মুজফফর আহমদ /ড. তরুণ মুখোপাধ্যায় | ১২৮-১৩০ |
| বাংলা লোকনাটকে মেয়েরা/ ড. সুমিতা চট্টোপাধ্যায় | ১৩১-১৩৬ |
| বাংলা নাটকে সংলাপের বিবর্তন/ আশিস রায় | ১৩৭-১৪৮ |
| Glimpses of Cultural Traditions in Jangalmahal through Bandna Parab and Chhou Naach /Shaktipada Kumar | 149-180 |
| ‘Kochi’as Cinematic City : A Study in Contemporary Malayalam Cinema/Sreedevi.P.Aravind | 181-199 |
| ‘The Gap between Myth and Reality’: A case study of Mama Bhagne Paharh/Md.Intaj Ali | 200-211 |
| Social Integration through Human Upliftment by Swami Vivekananda’s Thought / Manoj Kumar Yadav | 212-221 |
| The Dalai Lama’s Views on Religion, Peace and Environmental Protection-Some Reflections/  Dr. Malvika Ranjan | 222-230 |

সম্পাদকীয়

এত কম সময়ে পত্রিকা এত জনের কাছে পৌঁছবে এটা ভাবিনি। ভাবতে পারিনি সকলে পত্রিকাটি এত ভালো ভাবে গ্রহণ করবেন। এবারের সংখ্যায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও অধ্যাপকদের কাছ থেকে লেখা পেয়েছি এবং প্রতিটি লেখাই খুব সমৃদ্ধ। ড. ব্রততী চক্রবর্তী, ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়, ড. নমিতা ভট্টাচার্য, ড. ঋতম মুখোপাধ্যায় এনাদের লেখা পত্রিকায় পুণঃমুদ্রিত করা হল ।

পত্রিকা সম্পর্কে ওয়েবসাইটে যে মতামত পেয়েছি তা অনেকটাই গ্রহণ করেছি। আপনাদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আরো এমন সাহায্যের আশা রাখি।

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

এই সংখ্যার পত্রিকাটি পাঠক মহলে ভালো সাড়া ফেলেছে। সহৃদয় পাঠকের চাহিদার জন্য পত্রিকার দ্বিতীয় সংস্করণ বার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এজন্য পরবর্তী সংস্করণে পুনঃমুদ্রিত না করে আরো কিছু নতুন লেখা সংযোজন করা হল। একই সঙ্গে প্রবন্ধের বিষয়ের ক্ষেত্রে সংযোজন ও বিয়োজনও করা হয়েছে। এক কথায় অনেকটাই নতুন রূপে প্রকাশিত হল সংখ্যাটি।

সম্পাদক সুকুমার রায়

ড. ব্রততী চক্রবর্তী

অধ্যাপিকা,বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

‘একদা নিশীথে এক সম্পাদক গোবেচারা।

পোঁটলাপুঁটলি বাঁধি হইলেন দেশছাড়া।

অনাহারী সম্পাদকী হাড়ভাঙা খাটুনি সে।

জানে তাহা ভুক্তভোগী। অপরে বুঝিবে কিসে!’

‘সম্পাদকের দশা’ কবিতায় ‘সন্দেশ’-সম্পাদক সুকুমার রায় তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পত্রিকা সম্পাদনার ‘হাড়ভাঙা খাটুনি’র কথা জানিয়েছেন এমনই কৌতুকছলে! একটি সাহিত্য পত্রিকাকে গ্রহণযোগ্য, জনপ্রিয় ও মূল্যবান করে গড়ে তুলতে কী পরিমাণ পরিশ্রম হয় তা ‘ভুক্তভোগী’ সম্পাদক সুকুমার বুঝেছিলেন ভালোভাবে। সম্পাদনার বিষয়টি সততা, নিষ্ঠা ও যথোপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে নিষ্পন্ন করতেন তিনি। একটি পত্রিকাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য যত রকম ভাবনা-চিন্তা ও প্রয়াস করা যেতে পারে তা তিনি করেছেন। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের শেষ সাত বছর নয় মাস ‘সন্দেশ’ পত্রিকা সম্পাদনা (পৌষ, ১৩২২-ভাদ্র, ১৩৩০) করে বাংলা শিশুসাহিত্যের জগৎকে খুব দ্রুত মৌলিক সৃষ্টির ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি, তাকে দিয়েছেন সুউচ্চ পরিণতি।

সম্পাদক সুকুমার রায়-এর পত্রিকা সম্পাদনার প্রধান ক্ষেত্র ছিল তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯১৫) প্রতিষ্ঠিত ‘সন্দেশ’ পত্রিকা (বৈশাখ, ১৩২০)। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সাহিত্য ও মুদ্রণ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক-সাধনার প্রধান ফলশ্রুতি হোল ছোটদের জন্য প্রকাশিত তাঁর ‘সন্দেশ’ পত্রিকা। কিন্তু মাত্র দু-বছর আট মাস পত্রিকাটি সম্পাদনা করতে পেরেছিলেন তিনি – ১ বৈশাখ, ১৩২০ থেকে পৌষ, ১৩২২ পর্যন্ত। তাঁর মৃত্যুর (২০ ডিসেম্বর, ১৯১৫/বাংলা ৪ পৌষ, ১৩২২) পর ‘সন্দেশ’ সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন জেষ্ঠ্য পুত্র সুকুমার রায়, তখন তাঁর বয়স ২৮ বছর। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে কালাজ্বরে ভুগে তাঁর জীবনাবসান ঘটে (২৪ ভাদ্র, ১৩৩০/১০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩)।

সুকুমার সম্পাদিত ‘সন্দেশ’ (পৌষ, ১৩২২ - ভাদ্র, ১৩৩০) পত্রিকা বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে বিশিষ্টতার দাবী রাখে। যে বলিষ্ঠতা, বিচিত্রতা ও নিষ্ঠা তাঁর সম্পাদিত ‘সন্দেশে’ লক্ষ্য করা যায়, তার বীজ নিহিত ছিল সুকুমারের জীবনাদর্শে, তাঁর স্বল্প জীবন-পরিধির প্রাণবন্ত কর্মপ্রয়াসে। সুকুমারের মধ্যে ছিল সহজ নেতৃত্বগুণ; মানুষকে ভালোবেসে আপন করে নেবার প্রবণতা, জীবনের প্রতি প্রগাঢ় অভিরুচি! জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ভালো-মন্দকে শুধু অনুভব করা নয়, জীবনকে, সমাজকে ভালোর দিকে পরিচালিত করার একটা প্রবণতা খুব স্বাভাবিকভাবে কাজ করেছে তাঁর মধ্যে। নন্‌সেন্স ক্লাব, মানডে ক্লাব, ব্রাহ্ম যুব সমিতি প্রমুখ সুকুমার-প্রতিষ্ঠিত ঘরোয়া বা সামাজিক পরিমণ্ডলের সংস্কৃতি চর্চা ছাড়াও, ‘বিচিত্রা’র আসরে, ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার-সাধনে সুকুমারের ভূমিকা ছিল প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ, মৌলিক ও সাহসী। ‘সন্দেশ’ সম্পাদনার ভিত্তিভূমি অজান্তেই প্রস্তুত হয়েছে তাঁর নিতান্ত বালক বয়স থেকে।

বালক বয়স থেকেই সুকুমারের মধ্যে ছিল একটি সহজাত নেতৃত্বগুণ এবং অনাবিল হাস্যরস প্রবণতা। ছোটবেলা থেকেই ভাইবোনেদের মধ্যমণি হয়ে ‘মনগড়া অদ্ভুত জীবের গল্প’ বলতেন – ‘মোটা ভবন্দোলা’ কেমন হেলেদুলে থপথপিয়ে চলে, ‘মন্তুপাইন’ তার সরু লম্বা গলাটা কেমন পেঁচিয়ে গিঁট পাকিয়ে রাখে, গোলমুখো ড্যাবাচোখো ‘কোম্পু’ অন্ধকার বারান্দার কোণে দেয়ালের পেরেকে বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকে’ (দ্র. পুণ্যলতা চক্রবর্তী, ছেলেবেলার দিনগুলি)। কিংবা বালক বয়সে কারও ওপর নিরুপায় রাগ হলে ভাইবোনেদের বলতেন ‘আয় রাগ বানাই’। তারপর সবাই মিলে তার সম্পর্কে অদ্ভুত সব গল্প বানিয়ে বলে হাসির চোটে রাগটাগ ভুলে যাওয়া (দ্র. ঐ)। ‘আবোলতাবোলে’র বীজ এইভাবেই অঙ্কুরিত হচ্ছিল বালক সুকুমারের ঘরোয়া গালগল্পের মধ্যে দিয়ে।

ছাত্রাবস্থায় সিটি স্কুলে, পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে সুকুমার সহজেই সহপাঠীদের নেতৃস্থানীয় হয়ে ওঠেন। সম্পাদনার ক্ষেত্রে সুকুমারের প্রথম হাতেখড়ি হয় ১৯ বছর বয়সে **‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা’** নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। এ সময় ‘ননসেন্স ক্লাব’ নামে যে ক্লাবটি তিনি স্থাপনা করেন, পত্রিকাটি তারই মুখপত্র। এতে প্রধানত: থাকত নানাজাতীয় কৌতুক রচনা ও ছবি। ননসেন্স ক্লাবের সভ্যসংখ্যা প্রধানত: পরিবার ও আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বড় সদস্যরাও কমবয়সী সভ্যদের সঙ্গে সাহিত্য, শিল্প, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিতেন। সুকুমার ক্লাবে অভিনয়ের জন্য দুটি কৌতুক নাটক লিখেছিলেন ‘ঝালাপালা’ (১৯১১) ও ‘লক্ষণের শক্তিশেল’ (১৯১১)। আরও আগে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমকালে, বাঙালির উৎকট সাহেবীয়ানাকে ব্যঙ্গ করে সুকুমার প্রথম নাটক লেখেন – ‘রামধনবধ’। দুঃখের বিষয় নাটকটি মুদ্রিত হয়নি এবং তার পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায়নি। ‘পঞ্চতিক্ত পাঁচন’ নামে সম্পাদকীয় লেখা হত ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা’য়। এই বিশিষ্ট ক্লাব ও ততোধিক বিশিষ্ট পত্রিকার অকাল প্রয়াণ ঘটে সুকুমার বিদেশে পড়তে চলে যাওয়ায়।

‘ননসেন্স ক্লাব’ ছাড়া সুকুমার ‘ব্রাহ্ম যুবসমিতি’ নামে একটি সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে ১৯১০ সালে **‘আলোক’** নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন তিনি। প্রথম বর্ষে রবীন্দ্রনাথের “আলোয় আলোকময় করে এস হে” গানটি প্রকাশিত হয়েছিল। অক্টোবর, ১৯১১ সুকুমার উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য লন্ডনে চলে যাওয়ায় ‘আলোক’ পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু শিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে (সেপ্টেম্বর, ১৯১৩) সুকুমার ‘ব্রাহ্ম যুবসমিতি’কে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছিলেন। হিরণকুমার সান্ন্যাল লিখেছেন – ‘একটি ক্ষেত্রে সুকুমার রায়ের ব্যক্তিত্ব যেন আরো বেশি করে প্রকট হয়েছিল ও আমাদের আশ্চর্যভাবে স্পর্শ করেছিল। ওঁকে আরও বেশি করে আরো বড় করে পেলাম। সেই ক্ষেত্রটি হল ব্রাহ্মসমাজ।’ তিনি আরও লিখেছেন – ‘সুকুমার রায়ের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজের এক যুগান্তকারী পরিবর্তন হবে এই আশা ছিল অনেকেরই। কিন্তু কালাজ্বরের কালোছায়া আছন্ন করল তাঁকে’ (দ্র. পরিচয়ের কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র)।

দেশে ফিরে সুকুমারের সৃষ্টিশীলতা, রসসাহিত্য প্রকাশের আরও একটি মাধ্যম তৈরি করেছিল ‘মান্‌ডে ক্লাব’ নামে, যা খাদ্যরসিক সদস্যবৃন্দের দ্বারা ক্রমে মণ্ডা ক্লাবে রূপান্তরিত হয়। এই ক্লাবের সাহিত্য-সভার জন্য সুকুমার বেশ কিছু রসসাহিত্য ও গুরুগম্ভীর রচনা লেখেন বাংলা ও ইংরেজিতে, যার অধিকাংশ ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। চলচিত্তচঞ্চরী, জীবনের হিসাব, দৈবেনদেয়ম্‌, Fiction of Art, Asthetic Superstition ইত্যাদি রচনাগুলি এর উদাহরণ।

**২.** উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর সুকুমার রায় যখন ‘সন্দেশ’ সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন (পৌষ-মাঘ, ১৩২২), তখন উপেন্দ্রকিশোর-প্রতিষ্ঠিত ‘সন্দেশ’ পত্রিকার আদর্শ ও ঐতিহ্য তিনি বলবৎ রাখলেন। সাহিত্য- পাঠের নির্মল আনন্দের সঙ্গে অজান্তেই উপকৃত হওয়া, ‘সন্দেশে’র সেই ধারাবাহিকতাকে ভোলেন নি সুকুমার। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পত্রিকাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার দিকেও সতর্ক দৃষ্টি ছিল তাঁর। পত্রিকাটির অঙ্গসৌষ্ঠব ও বিষয়বিন্যাসের পরিচ্ছন্ন রুচি পূর্ববৎ থেকেছে। তবু সুকুমার সম্পাদনাকালে ‘সন্দেশ’ পত্রিকার প্রতিপত্তি আরও প্রবল হয়। অনুসারী রচনা থাকলেও মৌলিক রচনা-সম্ভারে ‘সন্দেশ’ আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সাহিত্যিক প্রেরণাবশতঃ সুকুমার এমন অভাবিত চমকপ্রদ সরস সৃষ্টিসম্ভার উপহার দিলেন যা ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল পাঠককে আনন্দ দিল। ‘সন্দেশে’র লেখকগোষ্ঠী ও বন্ধুদের নিয়ে সুকুমারের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সাহিত্য চক্র গড়ে উঠল। প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ, মধ্যমণি সুকুমারের উৎসাহ উদ্দীপনায় অনেক নবীন লেখক ‘সন্দেশে’র সাহিত্যিক গোষ্ঠীতে যোগ দিলেন।

‘সন্দেশে’র কাগজ, মুদ্রণ, বাঁধাই, অঙ্গসজ্জা সবই পূর্বের মত উন্নতমানের ছিল, কিন্তু বিষয়বস্তুতে, চিত্রসজ্জায় সুকুমারের ব্যক্তিত্বের অনুরূপ আসে নতুনত্ব। অভাবিত চমক সৃষ্টিকারী কৌতুকচিত্রের সমাবেশে ‘সন্দেশ’ পরম আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সুকুমার নিজের রচনার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রচনাকেও চিত্রসজ্জিত করেছেন। সে যুগের কয়েকজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পীও ‘সন্দেশে’র চিত্রসজ্জায় সহযোগিতা করেন – যতীন্দ্রকুমার সেন, অসিতকুমার হালদার, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হিতেন্দ্রমোহন বসু ছাড়াও অন্যতম চিত্রকর ছিলেন সুখলতা রাও, সুবিনয় রায়চৌধুরী প্রমুখ।

‘সন্দেশে’র বামপৃষ্ঠার প্রথম রঙিন চিত্রটি সাধারণতঃ পৌরাণিক কাহিনিভিত্তিক ছিল। কিন্তু সুকুমার পৌরাণিক বা শিশু-বিষয়ক চিত্রের সঙ্গে যোগ করলেন বিজ্ঞান-বিষয়ক চিত্র। তাঁর সম্পাদনায় ‘সন্দেশে’ পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, সমুদ্র ও সামুদ্রিক প্রাণিসমূহের অতি সুন্দর রঙিন পূর্ণপৃষ্ঠার ছবি ‘সন্দেশে’ নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। ছবির পর একটি কবিতা, তারপর অন্যান্য রচনা, শেষে বুদ্ধিদীপ্ত ধাঁধা। দেশী- বিদেশী রূপকথা-উপকথা-পুরাণকাহিনি অবলম্বিত রচনার সঙ্গে সঙ্গে অনূদিত বিদেশী গল্প-উপন্যাসের সংখ্যাও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। নিরবচ্ছিন্ন মৌলিক গল্প-কবিতা-নাটক-প্রবন্ধাদির প্রকাশে ‘সন্দেশ’ আরও উন্নতমানের হয়ে ওঠে। সুকুমারের বিজ্ঞানশিক্ষা, সমাজচেতনা, মজলিসি স্বভাবের প্রতিফলনে ‘সন্দেশ’ পত্রিকা অনেক বেশি বুদ্ধিদীপ্ত, উজ্জ্বল, অর্থবহ, পরিণত হয়ে ওঠে। ‘সন্দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক সুকুমার রায় অন্য লেখকদের রচনা প্রয়োজন মতো পরিমার্জন, সংশোধন করতেন পত্রিকারই স্বার্থে, ফলে তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

উপেন্দ্রকিশোরের সময়ে যাঁরা ‘সন্দেশ’-এর লেখক গোষ্ঠীতে ছিলেন, তাঁরা সুকুমার সম্পাদিত ‘সন্দেশ’ পত্রিকারও নিয়মিত লেখক ছিলেন – কুলদারঞ্জন রায়, সুখলতা রাও, সুবিনয় রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, চণ্ডীবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, জ্যোতির্ময়ী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায় প্রমুখ লেখকদের সঙ্গে এবার যোগ দিলেন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেন, নজরুল ইসলাম, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, অসিতকুমার হালদার, জীবন্ময় রায়, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মুকুলচন্দ্র দে, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, শান্তিলতা চৌধুরী, হিতেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, শৈলসরসী দেবী, সরলা দত্ত, সুনীতি দেবী এবং আরও অনেকে।

রবীন্দ্রনাথের ‘বৃষ্টি-রৌদ্র’ (ভাদ্র, ১৩২৯), ‘সময়হারা’ (বৈ. ১৩৩০) প্রমুখ কয়েকটি কবিতা ‘সন্দেশে’র গৌরব বাড়ায়। অবনীন্দ্রনাথের ‘খাতাঞ্চীর খাতা’ সন্দেশে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (বৈশাখ-মাঘ, ১৩২৭)। সীতাদেবীর ‘আলোছায়া’ (কার্তিক-চৈত্র, ১৩২৬), ‘নিরেট গুরুর কাহিনী’ কৌতুক রচনা (ভাদ্র-চৈত্র, ১৩২৩) ‘সন্দেশে’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। অসিতকুমার হালদারের ‘হো-দের গল্প’ প্রথমে ‘সন্দেশে’ মুদ্রিত হয় (বৈশাখ, ১৩২৫)। আরও কয়েকটি গল্প তিনি ‘সন্দেশ’-এ প্রকাশ করেন। প্রিয়ম্বদা দেবীর ‘পঞ্চুলাল’ মাঘ, ১৩২৫ থেকে কার্তিক, ১৩২৬ ধারাবাহিকভাবে ‘সন্দেশে’ প্রকাশ পায়। প্রায় প্রতি সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর সরস বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধগুলি সন্দেশের আকর্ষণ বাড়ায়। প্রতি সংখ্যায় কুলদারঞ্জন দেশবিদেশের পুরাণ ও ধ্রুপদী সাহিত্যের নির্যাস পরিবেশন করেন অসীম দক্ষতায়। সুবিনয়, পুষ্পলতা, ইলা রায়, শান্তিলতা, লীলা রায় প্রমুখ পরিবারের অনেকেই পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারায় এবং বিশেষতঃ সুকুমারের অনুপ্রেরণায় ‘সন্দেশে’র লেখকগোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করেন। সর্বোপরি ছিল সুকুমারের নিজের লেখা অসাধারণ ছড়া, গল্প, কবিতা, নাটক, জীবনী, প্রবন্ধ, ধাঁধা ইত্যাদি ও সেই সঙ্গে ছবি।

‘সন্দেশ’ পত্রিকায় সুকুমারের লেখা বিভিন্ন স্বাদের অনেকগুলি গল্পের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাঁর প্রধান দুটি বই – ‘হযবরল’ ও ‘পাগলা দাশু’র আত্মপ্রকাশও ‘সন্দেশে’। জৈষ্ঠ্য-ভাদ্র, ১৩২৯, ‘হযবরল’ ধারাবাহিকভাবে ‘সন্দেশে’ প্রকাশিত হয়েছিল, যা একটি বালকের বিচিত্র কৌতুকপ্রদ স্বপ্ন পরিভ্রমণের কাহিনি। খেয়ালরসের আরও দুটি উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা লিখলেন সুকুমার, ‘হেশোঁরাম হুশিয়ারের ডায়েরি’ (বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য, ১৩২৯) ও ‘দ্রিঘাংচু’ (অগ্র, ১৩২৩) নামে। সত্যজিৎ রায় ‘দ্রিঘাংচু’ গল্পটিকে সুকুমারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনার সম্মান দিয়েছেন। স্কুল পড়ুয়া ছেলেদের নিয়ে লেখা কৌতুক কাহিনিগুলি পরে ‘পাগলা দাশু’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯৪০)। ‘আবোল-তাবোল’, ও ‘খাইখাই’ বইদুটির কবিতাগুলি প্রথমে ‘সন্দেশে’ প্রকাশিত হয়েছিল। ‘আবোলতাবোল’ বইয়ের পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন, বইয়ের নামকরণ, প্রচ্ছদ-অঙ্কন-অঙ্গসজ্জা, প্রুফ সংশোধন সবই তিনি রোগশয্যায় নিজে হাতে করে গিয়েছিলেন, এমন কি গ্রন্থের প্রথম ও শেষ কবিতাদুটিও গ্রন্থের প্রয়োজনে নতুন করে তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু বইটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর নয় দিন পরে ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ সালে।

কবি জীবনানন্দ দাশ দিলীপকুমার গুপ্তকে একটি চিঠিতে লিখেছেন (কোরক, সুকুমার সংখ্যা, ১৪০৯, পৃষ্ঠা-২১৪)— ‘সুকুমার রায়ের পৃথিবী— ‘আবোলতাবোলে’ যা সত্য হয়ে ফলে উঠেছে তা আমাদের চেনাজানা পৃথিবী কিংবা তার প্রতিচ্ছবির মতো বাস্তব না হয়েও তেমনি পরিচিত ও তেমনি সত্য, এইখানেই কবির সাধাসিধে ভাবে সে এক অনন্যসাধারণ শক্তি; আমি কোনও স্বদেশী বা বিদেশী সাহিত্যিকের লেখায় ঠিক এই ধরনের প্রতিভার পরিচয় পাই নি।’

আবোলতাবোলের কবিতাগুলি তার ভাব, মেজাজ, ভাষা, শব্দ প্রয়োগ, ছন্দ, কল্পনা, বাস্তব, পরাবাস্তব, কৌতুক সবকিছুর মিশ্রণে এক অভাবনীয় খেয়ালরসের জগতের নির্মাণ করেছে, যা সুকুমারকে শিশুর জগতের সীমাবদ্ধতায় বেঁধে না রেখে, সকল সাহিত্যপ্রেমী রসগ্রাহী পরিণত পাঠকের মনের কাছাকাছি এনেছে। শিশুসাহিত্যিকের ছদ্মবেশে তিনি বস্তুতঃ সর্বসাধারণের লেখকই ছিলেন, তাঁর কবিতায়, নাটকে, প্রবন্ধ-এর পরিচয় সর্বত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

‘সন্দেশে’ সুকুমারের লেখা উন্নতমানের প্রচুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যার সিংহভাগ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ। প্রকৃতি ও মানুষও তাঁর প্রবন্ধের বিষয় হয়েছে। বিভিন্ন মনীষীদের জীবনী ছাড়াও, জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি নানান বিজ্ঞান বিষয়ক বহু প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। বিশেষত জীবজগৎ বা জীববিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। এ জাতীয় রচনাগুলি পরবর্তীকালে ‘জীবজন্তু’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় আনন্দ পাবলিশার্স থেকে, ১৯৭৪ সালে। সুকুমারের সচেতন, সংবেদনশীল মন ও কৌতুক দৃষ্টিতে তাঁর প্রবন্ধগুলি অভিষিক্ত।

‘উহ্যনাম পণ্ডিত’ নামে বিবরণাত্মক কিছু রচনা সন্দেশে প্রকাশ করেন সুকুমার। এই নামটি পূর্বেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন ‘ননসেন্স ক্লাবে’র মুখপত্র ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা’ নামের হস্তলিখিত পত্রিকায়।

‘সন্দেশে’ প্রকাশিত সুকুমারের নিজের রচনাগুলিতে তাঁর নাম থাকত না, তবে অন্যান্য লেখকদের নাম মুদ্রিত হত। ধারাবাহিক রচনাগুলিতে লেখকের নাম থাকত রচনার শেষে। সুকুমার নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের পক্ষপাতী ছিলেন। ‘সন্দেশ’ সম্পাদনার শেষ আড়াই বছর ডায়াবিটিস ও কালাজ্বরে গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় মেজভাই সুবিনয় তাঁকে সম্পাদনায় সাহায্য করতেন। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে, ২৪ ভাদ্র ১৩৩০ (১৯২৩) সুকুমারের মৃত্যুর পর ‘সন্দেশ’ সম্পাদনার দায়িত্ব নেন সুবিনয় রায়চৌধুরী। নানান বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ‘সন্দেশ’ বন্ধ হয়ে যায় ১৩৪২ সালে।

দীর্ঘকাল পর বৈশাখ, ১৩৬৮ সত্যজিৎ রায় নবপর্যায় ‘সন্দেশ’ প্রকাশ করে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করেন। সে অন্য ইতিহাস!

সুকুমার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান মূল্যায়ন স্মরণ করি—

“সুকুমারের লেখনী থেকে যে হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে তা অতুলনীয়। তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি, তাঁর ভাব সমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল, সেইজন্যই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাছলে দেখাতে পেরেছিলেন। … সুকুমারের অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাসের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না। তাঁর এই বিশুদ্ধ হাসির দানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অকালমৃত্যুর সকরুণতা পাঠকদের মনে চিরকালের জন্য জড়িত হয়ে রইল।” (দ্র. পাগলা দাশুর ভূমিকা)

পরিশেষে সত্যজিৎ রায় সুকুমার-সম্পাদিত ‘সন্দেশে’র যথার্থ মূল্যায়ন করে যে কথা বলেছেন তা দিয়ে বক্তব্য শেষ করছি— “বাবার ‘সন্দেশে’র চেহারাটা ঠাকুর্দার ‘সন্দেশে’র থেকে অনেক আলাদা হয়ে গেল। শিশুদের পত্রিকা থেকে হঠাৎই কিশোরদের পত্রিকা হয়ে উঠল।” (-ভূমিকা, সুকুমার রায়ের সমগ্র শিশুসাহিত্য, আনন্দ)।

অন্যান্য দেশের জাতীয় সঙ্গীতের তুলনায়

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত

ড. সৌমিত্র শেখর

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’ রচনার শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দেশাত্মবোধক অমর সঙ্গীতটি রচনা করেন এবং তা সে-বছরই বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩১২ বঙ্গাব্দ সংখ্যা) প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জাতীয় সঙ্গীতের তুলনায় বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে পরিস্ফুটিত হয়েছে স্বদেশের লগ্ধি স্বরূপ, এই অঞ্চলের অধিবাসিদের অহমিকাশূণ্য আত্মজাগরণ এবং দেশের জন্য আত্মনিবেদনের প্রত্যয়। সঙ্গীতটির প্রথম দশ পঙ্‌ক্তি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ গানটি লিখেছেন স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়ায়। কবি নিজেও এ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন প্রথম পর্যায়ে। পরে স্বদেশী আন্দোলনের নীতি ও কর্মপন্থা নিয়ে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটলে তিনি প্রত্যক্ষ আন্দোলন থেকে সরে যান এবং শান্তিনিকেতনে অবস্থান করেন। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যঃ ‘দেশে যদি বর্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইহদের প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মতো লোকের কর্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকান্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিবে।’ (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখাপত্রঃ ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩১২)। ১৩১২ বঙ্গাব্দের ৩০শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫) বঙ্গভঙ্গ হলো। তার মাত্র দু-মাসের কম সময়ের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী নেতৃত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতোবিরোধ ঘটে। কেন এমনটি হলো? এর একটি কারণ অবশ্যই, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার সঙ্গে অন্যদের স্বদেশ চিন্তার বিরোধ ছিলো। তৎকালীন নেতৃত্বের স্বদেশচিন্তা সেখানে উন্মুক্ততার ইশারা দেয়। তাঁর স্বদেশচিন্তার মধ্যে পরধর্ম বা পরজাতিবিদ্বেষ ছিলো না, ছিলো না উগ্র জাতীয়বাদ বা সাম্প্রদায়িকতা, ছিলো না আত্মগর্ব, অহংকার অথবা স্বজাতিশ্রেষ্ঠত্বের অহমিকাও। রবীন্দ্রনাথ বাঙালির সম্মিলিত ঐশ্বর্য ও শক্তি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। শুধু পর্যবেক্ষণই নয়, তাতে আস্থাও ছিলো তাঁর। কবি বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিলেন না। ছিলেন না এ-কারণে যে, বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ইংরেজরা ভারতের বৃহত্তম জাতিকে (বাঙালি) কার্যত বিভক্ত করতে চাচ্ছে। ‘ডিভাইড এণ্ড রুল’ নীতিতে বিশ্বাসী ইংরেজদের দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে (যদিও ধর্মের নামে জাতি বিভক্তি হতে পারে না) ভারত ও পাকিস্তান ভাগ করার ‘টেস্ট কেস’ ছিলো বঙ্গভঙ্গ। ১৯৪৭ সালেও যেমন, ১৯০৫ সালেও তেমনি হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ ইংরেজদের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। তারা হিন্দু বা মুসলমানের নেতা হয়েছিলেন, হিন্দু-মুসলিমের নেতা হন নি বা হতে চান নি। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন সম্প্রীতির বাণী নিয়ে, ঐক্যবদ্ধতায় দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে। হিন্দু-মুসলিমের সমন্বিত সাধনাই ছিলো রবীন্দ্রনাথের সাধনা। তাই বঙ্গভঙ্গ হবার দিনে (১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫) রবীন্দ্রনাথ নিজে উদ্যোগী হয়ে আয়োজন করেছিলেন হিন্দু-মুসলমান মিলনের উৎসব ‘রাখী বন্ধন’ এর। উৎসবের স্লোগান ছিলো; ‘ভাই ভাই এক ঠাই’। রবীন্দ্রনাথ নিজে বহু মুসলমান জনতার হাতে রাখী বেঁধে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার আহ্বান জানান। রাখী বন্ধন উৎসবের আর একজন উৎসাহী আয়োজন, তিনিও বিখ্যাত লেখক, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ত্রিবেদী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় কবি খুবই উৎসাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ছিলো একান্তই তাঁর নিজের মতো। ইংরেজদের বিভেদনীতির ফলে সৃষ্ট বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি সম্প্রদায়- বিশেষের একক নেতৃত্ব নয়, হিন্দু-মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব এবং তাদের ইচ্ছার প্রতিফলনের পক্ষে ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠছে, তখন (১৩১২ সালের ৯ই ভাদ্র) রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্য সভায় পঠিত এক প্রবন্ধে বলেনঃ ‘এই অভিপ্রায়টি মনে রাখিয়া দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার নায়ক করিব। তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব; তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া আমাদের দেশকে সম্মানিত করিব।’ (-অবস্থা ও ব্যবস্থা) অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বে আস্থা ও বিশ্বাস রেখে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন অখণ্ড বাঙালিত্ব। রবীন্দ্র-অন্বিষ্ট এই ঐক্যবদ্ধতা ও যুগ্মনেতৃত্ব পরবর্তীকালে দেখা যায় নি। তাঁর প্রত্যাশিত অখণ্ড বাঙালিত্বের চেতনাও ম্লান হয়েছে বারংবার। তাই তিনি অল্প সময়ের ব্যবধানে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ওই আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নিজেই স্মপ্রীতি ও মিলনের ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বেলে একা কাজ করে গেছেন। বঙ্গভঙ্গ – বিরোধী ওই আন্দোলন থেকে সৃষ্ট ব্রিটিশ পণ্য বয়কট আন্দোলনের সমস্যা ও দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরবর্তী গল্প-উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলতে দ্বিধা বোধ করেন নি। তাই একথা বলা চলে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অংশগ্রহণ এবং অল্প পরে সেখান থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার ব্যাখ্যা তৎকালীন প্রচলিত রাজনৈতিক আন্দোলনের নিরিখে করা যাবে না; তা করতে হবে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতের বিশাল পরিধি পরিপ্রেক্ষিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বৃটিশ পরিকল্পিত বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সক্রিয়, তখন তিনি বেশ কয়েকটি গান রচনা করেন। যেমন-

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি;

ও আমার দেশের মাটি তোমার’ পরে ঠেকাই মাথা;

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না,মা;

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে;

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি;

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এদেশে ইত্যাদি।

গানগুলো মা-মাটি-মানুষের যৌথ সংশিষ্টতায় রচিত। অখণ্ড বাঙালিত্বের চেতনা জাগরূক থাকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর এ গানগুলোর সুর দেওয়ার ক্ষেত্রে বাউল বা বাংলার লোকসুরকেই নির্বাচন করেছিলেন। কবির বহু গানে ভারতী বিভিন্ন প্রদেশের ঋদ্ধ সঙ্গীতের সুর-প্রভাব আছে, আছে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাবও। কিন্তু এই দেশভাবনামূলক গানসমূহে রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে যেকোনো বহিরাগত সুর, তা যতো আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, পরিত্যাগ করলেন এবং গ্রহণ করলেন গ্রামবাংলার হৃদয়ের স্পন্দন, সেই মেঠো সুরকে। ওই সময়ে রবীন্দ্রনাথ রচিত গানগুলো প্রকাশিত হয়েছিলো ভাণ্ডার (ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩১২) ও বঙ্গদর্শন (আশ্বিন,১৩১২) পত্রিকায় এবং সেগুলো বাউল নামে একটি পুস্তিকায় সংকলিত হয়েছিলো। ‘বাউল’ নামকরণেও রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার বোধটি স্পষ্ট বোঝা যায়। এই সংকলিত গানগুলোর মধ্যে ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি’ গানটি অনন্য, সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় এবং শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। শুধু ওই সময়ে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যেই নয়, রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গানসমূহের নিরিখেই এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা চলে। এমন কি একই কথা বলা চলে রবীন্দ্র-সমকালে যাঁরা দেশাত্মবোধক গান রচনা করছিলেন, তাঁদের অবদানকে স্মরণে রেখেও। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত দেশাত্মবোধক ‘ধন্যধান্য পুষ্পে ভরা’ গানে এদেশকে পৃথিবীর সেরা বলার আত্মম্ভরিতা আছে, রবীন্দ্রনাথের ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে’ গানে পরোক্ষভাবে ‘আমি’র একলা চলো নীতিকেই সমর্থন করা হয়েছে, তাঁরই ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’ গানে শুধু ভগবানের নাম (গড, খোদা, আলাহ নয়) উচ্চারিত হয়েছে। এমন কি তৎকালে এবং আজও জনপ্রিয় কবি ইকবালের ‘সাঁরে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা’ সঙ্গীতে হিন্দুস্থানকে পৃথিবীর সেরা বলে মনে করার কবিইচ্ছা ব্যক্ত। সে তুলনায় ‘আমার সোনার বাংলা’ গানে কোন আত্মম্ভরিতা নেই, উগ্রতা নেই, অন্য দেশকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসিকতাও প্রকাশিত হয় নি। আছে স্বদেশের রূপশ্বৈর্যের সরল বর্ণনা আর মাতৃভাষার প্রতি প্রচুর অনুরাগ। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটির নির্বাচন এ জন্যি সার্বিক অর্থে যথাযথ ও অর্থপূর্ণ। তাছাড়া এই গানে একই সঙ্গে উঠে এসেছে এমন একটি চেতনা, যে চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের মানুষ পরবর্তীকালে রক্ত দিয়ে সৃষ্টি করে ‘বায়ান্ন’ ও ‘একাত্তর’। এ-প্রসঙ্গে গান থেকে মাত্র দুটি পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করা যেতে পারেঃ ‘মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো’- এই চেতনা ভাষা আন্দোলনের; ‘চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি’- এই চেতনা মুক্তিযুদ্ধের। অর্থাৎ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত একই সঙ্গে ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শাশ্বত বাংলার লগ্ধি স্বরূপকে ধারণ করেছে। এখানে একটি শব্দও উগ্র জাতীয়তাবাদী বা সম্প্রদায়-বিশেষের নিজস্ব নয়। এই গানের সুর করা হয়েছে কুষ্টিয়ায় প্রচলিত বাউল গানের সুরে। কোনও জগদ্বিখ্যাত পাশ্চাত্য সুরকারের সুর অনুসরণে নয়, নয় ভারতীয় কোনও প্রদেশের গানের সুর অবলম্বনে – ‘আমার সোনার বাংলার’ গায়ে সুরের অলংকার পরানো হয়েছে বাংলাদেশের পদ্মার তীরেও গীত হয়া একটি গানের সুর অনুসারে। কুষ্টিয়ায় গগন হরকরা চিঠি বিলি করার সময় নাকি মনের আনন্দে নেচে নেচে গাইতো , এবং পথ চলতেন। রবীন্দ্রনাথকে খুব আকৃষ্ট করেছিলেন এই গগন। তাঁর কণ্ঠেই রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন একটি গানঃ ‘আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে –রে/ হারায়ে সেই মানুষে, দেশে বিদেশে বেড়াই ঘুরে’। এই সুর রবীন্দ্রনাথকে এতোটাই আবিষ্ট করেছিলো যে, তিনি ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ গানে সংস্থাপিত করলেন এই সুররত্ন; যে রত্ন বাংলার মাটির গন্ধে ভরা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ভারতের জাতীয় সঙ্গীত ‘জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা’ সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা উত্থাপন করতে পারেন ভাগ্যে অবিশ্বাসী মানুষেরা। একইভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন তারা, যারা জীবনে কোন দিন ‘বিধাতা’ শব্দটি উচ্চারণ করার প্র্যোজন বোধ করেন নি। এজাতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করার মতো জনগণমন শতকোটির দেশে নিশ্চয়ই অনেকে আছেন। বিশ্বের অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশ ইংল্যান্ডের জাতীয় সঙ্গীতে কথাই নেই, আছে রাজার নিরাপত্তা চেয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। সেই সঙ্গীতে বলা হয়েছেঃ

‘God save our Gracious king! Send him victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us-

God save the king!’

বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ এবং অর্থনৈতিকভাবে পরাশক্তি জাপানের জাতীয় সঙ্গীতেও আছে রাজার বন্দনা। জাপানের জাতীয় সঙ্গীতের নাম ‘কিমিয়াগো’। এর বঙ্গানুবাদঃ

‘অযুগ যুগ ধরি বিরাজ, মহারাজ!

রাজ্য হোক তব অক্ষয়,

উপল যতদিন না হয় মহীধর,

প্রভূত শৈবালে শোভাময়।’

পৃথিবীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ, শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতে রাজার গুণকীর্তন নেই সত্য, তবে সেখানে স্বদেশের ভূপ্রকৃতি নিয়েও কোনও কথা নেই। সঙ্গীতটি একজন সাধারণ যোদ্ধার অনুভূতি প্রকাশক। ১৮১৪ সালে ইংরেজ-মার্কিনযুদ্ধে ইংরেজবাহিনীর রাত্রিকালীন গোলা আক্রমণে আমেরিকার ফোর্ট ম্যাকহেনরি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভোরে ফ্রান্সিস স্কট নামক এক মার্কিন সৈন্য দেখতে পান, রাতভর ইংরেজবাহিনীর ব্যাপক গোলা নিক্ষেপে ফোর্ট ম্যকহেনরি ব্যাপক ক্ষতি হলেও তার শীর্ষে উড়ানো মার্কিন পতাকা কাকতলীয়ভাবে বিন্দুমাত্র ক্ষত বা নষ্ট হয় নি। এ দৃশ্যটি তাকে আবেগায়িত করে তোলে। এই দৃশ্য দেখেই উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি রচনা করেনঃ

‘Oh say! Can you see by the dawn’s early light

What so proudly we hailed at the

Twilights first gleaming?

Whose broad stripes and bright stars

Through the perilous fight

O’er the ramparts we watched

Were so gallantly streaming?’

একজন সৈনিকের আবেগে যে গানটি রচিত হয়েছিলো তা আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত। ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতাও একজন ক্যাপ্টেন, অর্থাৎ সৈনিক। ১৯৭২ সালে ফ্রান্স-রাশিয়া যুদ্ধের সময় ফরাসি সৈনিকদের উদ্দীপ্ত করার জন্য Rouget de Lisle (রুজে দ্য লিল) নামের এক ফরাসি ক্যাপ্টন এক ঘন্টার মধ্যে রচনা করেন এই সঙ্গীতটিঃ

‘Allons enfants de la patrie

Le jour de gloire est arrive-’

এর বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে এভাবেঃ

‘পিতৃভূমির সব সন্তান কোথা রে।

কীর্তিলাভের ক্ষণ এসে গেছে দুয়ারে। ’

এই সঙ্গীতটি পরে ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালের জাতীয় সঙ্গীতে রাজা ও ঈশ্বরের বন্দনা ছিলো। ২০০৮ সালে প্রচণ্ডের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা নেপালের রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করার পর এই সঙ্গীতের বদল ঘটে। সে কারণেই, পৃথিবীর প্রধান দেশগুলোর জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ঈশ্বর বা খোদাস্তুতিমূলক কোনও শোক নয়, অখ্যাত কোনো সৈনিকের তাৎক্ষণিক আবেগপ্রসূত গানও নয়। এটা বাংলা ভাষার প্রধান কবির রচনা। এই গানে যুদ্ধের আহ্বান নেই, ক্ষ্ণিকের আবেগের ফসল নয় এই গান, এই সঙ্গীত বিধাতা বা নেতা/রাজার বন্দনাগীতও নয়। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে ধারণ করা আছে বাঙালির ভাষা, মুক্তিযুদ্ধ ও শাশ্বত দেশচেতনা, মেঠো বাউলের সুরে, নরম ভাষায়, বিনম্রতায়। তাই এই গান শুধু স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত নয়, বাঙালি প্রাণসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে।

আশালতা সেন ( ১৮৯৪-১৯৮৬ )

ড. নমিতা ভট্টাচার্য

অধ্যাপিকা,বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

“আপানারে নারী, পূজা কর আজ, পূজা কর আপানায়,-

আপানার মাঝে লও জাগাইয়া, আপানার দেবতায়।”

ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ দীপ্তস্বরূপা রমণীদের পূর্ণ পরিচয় আমরা বৈদিক যুগ থেকেই পাই। এই সময়ে লোপামুদ্রা, অপালা, রোমশাদের মতো তপঃসিদ্ধা নারীদের আমরা পেয়েছি। উপনিষদের কালে পেয়েছি ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী, গার্গী, হৈমবতীদের। মধ্যযুগেও ক্ষমা, পদ্মাবতী, মীরাবাঈদের মতো সাধিকারা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। স্মরণীয়া সেইসব নারীদের অনুসরণ করে একালেও জ্ঞানের প্রদীপ হাতে যে সব রমণী আমাদের মধ্যে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন বিশিষ্টা হলেন আশালতা দেবী ( ১৮৯৪-১৯৮৬)।

২ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪ সালে আশালতার জন্ম হয়েছিল পিতামহের কর্মস্থান নোয়াখালিতে। পিতামহ মুন্সী কাশীনাথ দাশগুপ্ত ফার্সিতে পন্ডিত ছিলেন। বাংলায় তিনি ‘কন্যাপণ বিনাশিকা’ নামে বই লেখেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় সেকালে গ্রাম-গ্রামান্তরে ডাক বিলির ব্যবস্থা চালু হয়। মেধাবী পৌত্রী আশালতা তাঁর ‘সেকালের কথা’য় মনে করিয়ে দিলেন তাঁর পিতামহের লোকসেবার প্রশংসায় কবি ঈশ্বর গুপ্তের এই প্রশস্তি-

“ নিবসিত বিদগ্রাম, বৈদ্য কাশীনাথ নাম

পরিশ্রম অবিশ্রাম বিবিধ প্রকার

গ্রাম্য ডাক প্রচলনে করিলেন সযতনে

কত না অশেষ শ্রম বিশেষ প্রকার

জীবনের সার্থকতা পর উপকার ভায়া পর উপকার।”

আশা দেবীর সাহিত্যানুরাগী পিতা বগলামোহন দাশগুপ্তও মেয়েদের সামাজিক মর্যদাবৃদ্ধির চেষ্টা করেন। অর্জুনের তেজস্বিনী স্ত্রী সুভদ্রার সম্বন্ধে লেখা তাঁর রচনাটিতে নারী-পুরুষ সমানাধিকারে বিশ্বাসী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

আশালতা সেনের কাহিনির সূত্রপাতের পূর্বেও সূত্র আছে। তাঁর মাতৃকুলও ছিল বিদ্যানুরাগী, সংস্কারমুক্ত পরিবার। সেকালে সামাজিক বহু বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও মাতামহী নবশশী দেবী শাশুড়িকে লুকিয়ে লেখাপড়া শিখতেন দেবরের কাছে। অঙ্ক কষে খাতা লুকিয়ে রাখতেন বাগানের ঝোপের মধ্যে। দেবর অঙ্কের ভুল সংশোধন করে, অথবা অঙ্ক ঠিক হলে নতুন অঙ্ক দিয়ে আবার খাতাটিকে যথাস্থানে রেখে দিতেন। প্রসঙ্গতঃ রাসসুন্দরী দেবী ও কবি কামিনী রায়ের মা বামাসুন্দরী দেবীর কথা মনে পড়ে। রাসসুন্দরী দেবী পড়ার পাতা লুকিয়ে রাখতেন রান্নাঘরের কড়াইয়ের মধ্যে আর বামাসুন্দরী দেবী রান্নাঘরের কাঁচা মাটির দেয়ালে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে নিজের প্রচেষ্টায় অক্ষর লিখতে অভ্যাস করতেন। এবং প্রতেকদিন রান্নাশেষে মাটির লেপদিয়ে তা ঢেকে দিতেন। শুধুমাত্র নিজেই পড়ালেখা শেখেননি, দুই কন্যাকেও যথার্থ শিক্ষিত করেন এবং তারা বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধি অর্জন করে। তখপ্ন সমাজপতিদের ধারণা ছিল মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে দুর্নীতির পথ উন্মুক্ত হবে। তারা সকলের সঙ্গে গোপনে পত্রালাপ করবে।

সমাজের এই আবহাওয়ার মধ্যেও পরম আগ্রহে আশা দেবীর মাতামহী নিজে লেখাপড়া শিখে কন্যা মনোদা দাশগুপ্তকেও (আশা দেবীর মা) লেখাপড়া শেখান। তাঁর লেখা ‘জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরি’র (১৮৮৫-১৮৮৮) কাহিনি মাত্র চার বছরের। এই চার বছরের কথাকে যেন একটা যুগের কথা বলে মনে হয়। নিছক কোনও গৃহবধূর ডায়েরি নয়, এ যেন জীবন ও সমাজের অনুপম চিত্রমালা। মনোদা দেবী নিজের লেখাপড়া শেখার কথা ডায়রিতে লিখেছেন-“পুনরায় ঢাকা হইতে বিদায় লইয়া মধুময় স্কুল-জীবন জন্মের মতো পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম। মাতাঠাকুরানী বাড়িতে আসিয়াই অনেক ভালোভালো বই আনিয়া দিতে লাগিলেন। রাজস্থান, ডোরথীর জীবন-চরিত, সাধুদের নানা কাহিনিযুক্ত গল্পের বই ইত্যাদি। কিন্তু ইংরেজিটার দিকে বাদ পড়িয়া যাইতে লাগিল। বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক সবই বেশ ভালোভাবে মাতাঠাকুরানী পড়াইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু ইংরেজি পড়াইবার মতো জ্ঞান তাঁহার ছিল না, সুতরাং তখন ইংরেজিটা মুখ্য না হইয়া গৌণ হইয়া দাঁড়াইল।” (সেকালের গৃহবধূর ডায়েরি, প্রকাশকাল ১৯৯৬,পৃষ্ঠা-৫১)। সংস্কারমুক্ত, বিদ্যানুরাগী পিতৃকুল ও মাতৃকুলের পরিবেশেই আশাদেবী মানব কল্যাণ ব্রতের দীক্ষা পেয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কাজে আশালতা সেনের মাতামহী নবশশী দেবী বিলাতী দ্রব্য বর্জনের সংকল্প নেন। আশালতাকে দিয়ে সেই সংকল্প পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে স্বদেশীব্রতে তাঁকে দীক্ষিত করেন। গ্রামের মেয়ে ও বৌদের স্বাক্ষর করার ভার তাঁকেই দেন। এগার বছর বয়েসে এই প্রথম তাঁর দেশের কাজের সূত্রপাত।

১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে আশালতার কাব্য-চর্চারও সূচনা হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তাঁর জাতীয়তা মূলক কবিতা ‘অন্তঃপুর’ নামক কাগজে প্রকাশিত হয়। বারো বছর বয়সে সত্যরঞ্জন সেনের সঙ্গে আশালতার বিবাহ হয়, কিন্তু ১৯১৩ সালের শেষের দিকে পাঁচমাসের শিশুপুত্র কোলে তিনি বিধবা হন। কিন্তু ছয় বছরের মধ্যেই তিনি সবকিছু বিপর্যয় সামলিয়ে উঠে সাহিত্য ও স্ক্রিয় রাজনীতিতে জীবনের অর্থ ও আশ্রয় খুঁজে পেলেন। নিজেকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে তিনি ইতিমধ্যে দুটি বই লেখেন- একটি ‘ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জীবনী’ আর অন্যটি ইংরেজিতে ‘সাবিত্রী’ কাহিনি। কবিতার বই ‘উৎস’ –এর অনেক কবিতাও এই সময় লেখা হয়। তাঁর জীবন সংগ্রামে মস্তবড় সহায়ক ছিলেন তাঁর শ্বশুর মহাশয়।

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের দ্বারা আশালতা গভীর ভাবে প্রভাবিত হন। এই সময় থেকেই তাঁর রাজনৈতিক ও গঠন মূলক কর্মজীবন এক নতুন ধারায় বইতে শুরু করে। তিনি গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করেন ঢাকা শহরের গেন্ডারিয়ায়, নিজেদের বাড়িতেই মহিলাদের জন্য ‘শিল্পাশ্রম’ নামে একটি তাঁত বোনার কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি গান্ধীজির বাণী ও খদ্দরের কথা প্রচার করেন। স্মৃতিকথায় আশাদেবী লিখেছেন –‘স্থানীয় মেয়েরা যখন এই শিল্পাশ্রমে ঘরঘর করে চরকা আর খট্‌খট্‌ করে তাঁত চালাতেন গান্ধীজির বাণী যেন তার ভিতর দিয়ে চারিদিকে চ্চছড়িয়ে পড়ত।’ ঢাকা জেলা কংগ্রেসের মহিলা প্রতিনিধি রূপে তিনি গয়া কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করেন ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে ‘গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি’ স্থাপন করেন, এই কাজে তাঁর সহয়িকা ছিলেন সরমা গুপ্তা ও সরযূবালা গুপ্তা। মহিলা সমিতির বার্ষ্ক অনুষ্ঠান উপলক্ষে ‘শিল্পমেলা’ হতো। এই মেলাতে গৌতম বুদ্ধ থেকে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিভিন্ন মূর্তি ও ছবির সাহায্যে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হতো। এই সমিতির মহিলা কর্মীদের প্রধান কাজ ছিল খদ্দরের কাপড় ঘরে ঘরে গিয়ে বিক্রী করা ও মেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা। তিনি এই সময়ে মহিলা কর্মী তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ফলে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় ‘কল্যাণ কুটির আশ্রম’ স্থাপন করে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আর সেই সঙ্গে অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার জন্য অগ্রসর হন। গেন্ডারিয়ার কাছে ‘জুড়ান’ নামে একটি নমঃশূদ্র গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে সরমা গুপ্তার সাহায্যে এই গ্রামে ‘জুড়ান শিক্ষামন্দির’ নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১৯৩২ সালে সত্যাগ্রহের নেত্রী হিসাবে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে তাঁর সশ্রম কারাদন্ড হয়। কারাবাস কালে তিনি ‘বিদ্যুৎ’ কাব্যগ্রন্থের তেত্রিশটি কবিতা রচনা করেন। তাঁর ‘সেকালের কথা’ গ্রন্থখানির ভূমিকায় রানীচন্দ লিখেছেন-“আমাদের আশালতাদি নিজেই তাঁর কবিতায় তাঁর মহিমময় কর্মবহুল জীবনের ধুয়োটি আমাদের ধরিয়ে দিয়ে গেছেন।” তাঁর জীবনের আদর্শ বলে ‘বৈধব্য’ কবিতার যে লাইন দুটি রানীচন্দ চিহ্নিত করেছেন তা হলো-

“শান্ত মৌন আত্মদানে ক্লান্তিহীন নিঃস্বার্থ সেবায়,

জীবনের সার্থকতা লভিল সে পূর্ণ মহিমায়।”

এছাড়াও তাঁর জীবনের নিস্কাম ত্যাগের আদর্শ আরো কয়েকটি কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে।

কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে ১৯৪৬ –এ তিনি ঢাকা কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় আইনসভার সদর্স্য নির্বাচিত হলেন। ‘সেকালের কথা’ গ্রন্থে ১৯৪৭ সালে আমাদের স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “যেদিন বাংলার আইন সভায় দ্বিতীয় ‘বঙ্গভঙ্গের’ প্রস্তাব পাশ হল, সেদিন আমার জীবনের অন্যতম দুঃখের দিন।” ১৯৪৮-এ তাঁর পুত্র ডঃ সমর সেনকে ডেপুটি ইকনমিক অ্যাডভাইজারের পদে ভারত সরকার নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি পুত্রের সঙ্গে ভারত আসলেন না। ১৯৬৫ সালে অসুস্থ হলে তাঁর পুত্র তাঁকে ভারতে নিয়ে আসেন। এবং এই সময় থেকেই তিনি সাহিত্যের দিকে মন দেন। তাঁর বিভিন্ন সময়ে লেখা সহজ, সরল, সরস, সুন্দর গদ্য ও পদ্য রচনাগুলি আমাদের কাছে এক বিস্ময়ের বস্তু।

মানুষ কেবলমাত্র নিজের পারিবারিক গন্ডির ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবার জন্য পৃথিবীতে আসেনি। সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি, এমনকি সমস্ত মানব জাতির প্রতি, প্রত্যেক নারী-পুরুষেরই কর্তব্য রয়েছে। সেই কর্তব্য পালন করার সুযোগ ও ক্ষমতা অনুসারে প্রত্যেক মানুষেরই তা করবার জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত। আর সেকারণেই তিনি ১৩২৯ সালে বঙ্গের নারীদের জন্য সেবাব্রত ধারিণী বিদেশিনী নারী ‘ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলে’র পবিত্র জীবন কাহিনি লেখেন। নিবেদন অংশটিতে তিনি বলেছেন- “সেবিকা নাইটিঙ্গেলের কর্মক্ষেত্র ও কার্য্যপ্রণালী আমাদের সমাজস্থ নারীগণের নিকট যে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ও নূতন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যেভাবে কার্য করিয়া গিয়াছেন ঠিক সেই ভাবেই কার্য করা, আমাদের সমাজে সম্ভবপর বা প্রয়োজনীয় নাও হইতে পারে, কিন্তু পরার্থে আত্মোৎসর্গের যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমরা তাঁহার ভিতর দেখিতে পাই, তাহা সকলেরই প্রাণে সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক। সকলের শক্তি কখনও সমান নহে, ইহা নিঃশয়। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ ও নারীগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, আমাদের পক্ষে তাহা সাধন করা নিতান্তই কঠিন। কিন্তু যাহার যতটুকু শক্তি আছে, সে পরিমাণেই যদি আমরা কার্য করিতে অগ্রসর হই, তবে তাহাতেও আমাদের জীবন সার্থক হইয়া উঠে।”

তাঁর দুটি কাব্য গ্রন্থ ‘বিদ্যুৎ’ ও ‘উৎস’। এর কবিতাগুলি বিভিন্ন সময়ে লেখা। ‘বিদ্যুৎ’ বইটি প্রকাশের কিছু দিনের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার এটিকে বাজেয়াপ্ত করে। গদ্য ও কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত হয়েও তিনি জীবন সায়াহ্নে যে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন তা আমাদের কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর। তিনিই প্রথম মহিলা যিনি বাল্মীকি রামায়ণের সারাংশের পদ্যানুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নতুন রূপ সংযোজন করলেন। এর পূর্বে কবি রাজকৃষ্ণ রায় বাল্মীকি রামায়ণের বাংলা পয়ার ছন্দে পদ্যানুবাদ করেন। কিন্তু আশালতা সংস্কৃত অনুষ্টুপের স্পন্দন বাংলা ভাষার আনবার চেষ্টা করলেন। মূল রামায়ণের পদ্যানুবাদ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন –“বাল্মীকি রামায়ণ আমার খুব প্রিয় কাব্য। বাংলা ভাষায় এর ভালো গদ্য অনুবাদ আছে, কিন্তু ভাল পদ্য অনুবাদ নাই। বহু বছর আগে কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় কৃত অনুবাদই একমাত্র পদ্য অনুবাদ বলে আমি জানি। কিন্তু এই অনুবাদের ছন্দ বাংলা পয়ার ঘেষা। মূল সংস্কৃতের মাধুর্য এবং গাম্ভীর্য এতে নাই। তাই আমি চেষ্টা করলাম যতটা সম্ভব মূল সংস্কৃতের ধ্বনি সৌষ্ঠবের কাছাকাছি বাংলা অনুবাদ করতে, যদিও সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের কিছুটা প্রভেদ অপরিহার্য।”

তাঁর এই অনুবাদ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত পন্ডিত ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন –“তাঁহার এই পদ্যানুবাদ মূল রক্ষা করিয়াও সরলতা বিসর্জ্জন না দেওয়ার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন... শ্রীযুক্তা সেনের অনুবাদ দোষনির্মুক্ত। ...অনেক স্থলে শ্লোক্সথ সমাস-নিবিষ্ট পদসমূহের অর্থ ঠিক সমাসবদ্ধ পদের দ্বারাই প্রকাশিত হওয়ায় অনুবাদের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।” বাল্মীকির ‘রামং লক্ষ্মণপূর্ব্জং রঘুবরং সীতাপতিং’ আশালতার রামায়ণে ‘রাম রঘুবর যিনি লক্ষ্মণ-অগ্রজ সীতাপতি।‘ এই প্রসঙ্গে অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন-“এতাদৃশ অনুবাদ মূল পদ্যস্থিত প্রসাদ্গুণের অনুবর্ত্তনে সমর্থ হইয়াছে। ...শ্রীযুক্তা সেনের বর্ণনা শৈলী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, ভাষা সরল, মধুর এবং প্রকাশ ক্ষমতায় সমৃদ্ধ। বইখানি পড়িয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি, ইহা ঘরে ঘরে রাখিবার বস্তু।”

বাংলার নারীদের শিক্ষা, তাদের মানসিক চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। আর সেকারণেই বঙ্গের নারীদের কাছে বাংলার বিস্মৃত যুগের মহীয়সী, বিদুষী, সুপন্ডিতা মহিলাদের বিষয়ে আলোচনা। তিনি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ‘বাংলার সেকালের মেয়েদের কথা’-য় তুলে ধরার ব্যবস্থা করেছেন। মহিলাদের বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে বাংলার বিস্মৃত যুগ অর্থাৎ অতি আধুনিক কালও রামায়ণ-মহাভারতের সমসাময়িক কালের মধ্যবর্তী সুদীর্ঘ কালটাকে আমরা যেন নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছি।আর সেকথাই তিনি তাঁর এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আমাদের মনে করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন-“এই প্রবন্ধটি কেবল্মাত্র এই উদ্দেশ্যেই লিখিত হইল যে বাংলার নিজের অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করলে এমন কত মহিলার দেখা পাওয়া যাইতে পারে যাঁহারা যে কোনও দেশের ও যে কোনও জাতির পরম গৌরবের বিষয় হওয়ার উপযুক্ত।”সুতরাং এই বুইস্মৃত যুগের কিছু মহীয়সী মহিলাদের আলোচনার প্রসঙ্গে দেখা যায় খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মহিষী কুমারদেবী, সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের স্ত্রী দত্তদেবী, রুদ্রসেনের স্ত্রী প্রভাবতী গুপ্তা, কুমারগুপ্তের দ্বিতীয়া মহিষী অনন্তদেবী; খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে পাল রাজবংশের মানিক্য চন্দ্রের পত্নী রানী ময়নামতী ইত্যাদি অসাধারণ মানসিক শক্তিশালিনী নারীদের অবস্থান বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

রাজস্থানের রাজপুত রমণীদের কঠোর জহর ব্রত অনুষ্ঠানের উল্লেখও বাংলা ইতিহাসের একাদশ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় বল্লাল সেনের সময় সংঘটিত হয়েছিল। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরের সমসাময়িক কালে রাজা রুদ্র নারায়ণের মহিষী বীরাঙ্গনা ভবশঙ্করীর নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁর বীরত্বের কাহিনি শুনে সম্রাট আকবর তাঁকে ‘রায়বাঘিনী’ উপাধি প্রদান করেন। এই শতাব্দীর শেষ ভাগে পূর্ববঙ্গের চাঁদ রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীও ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীরাঙ্গনা রূপে চিহ্নিত। এই শতব্দীতে বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময়ও কোনো-কোনো বঙ্গ মহিলার প্রভাব প্রতিপত্তি দেখা যায়। অদ্বৈত-পত্নী সীতা ঠাকুরানী ও নিত্যানন্দ- পত্নী জাহ্নবী দেবীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কর্মকুশলতা এবং পবিত্র চরিত্রগুণে সমাজে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করেছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণনাথ সার্বভৌমের স্ত্রী বৈজয়ন্তী দেবী কাব্য,ব্যাকরণ ও দর্শনশাস্ত্রে সুপন্ডিতা ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লালা রামপতি সেনের কন্যা আনন্দময়ীও বিদ্যা ও কবিত্বশক্তির জন্য লোকপ্রিয় হয়েছিলেন। এই সময়েই শিবরাম সার্বভৌমের কন্যা প্রিয়ংবদা দেবীও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি সংস্কৃতে অনর্গল বাক্যালাপ করতে পারতেন এবং সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে সুখ্যাতি অর্জন করেন।

এটা ভেবে বিস্মিত হতে হয় যে, এই সুপন্ডিতা ও বিদূষী নারীদের আলোচনার ক্রমে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না যে ঠিক কোন্‌ সময় থেকে বাংলার নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের ‘স্বামী দেবতা’দের আয়ুর যোগাযোগ সংঘটিত হয়েছিল, ফলে অকাল বৈধব্যের আশঙ্কায় মেয়েরা লেখাপড়া শেখা সম্পূর্ণ বর্জন করেছিল।

অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত সংগ্রামিকার চলার পথে চিরশান্তি নেমে এল ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ ১৩ই ফেব্রুয়ারী। যিনি কোনো কিছুতেই জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাননি, যিনি মুক্তকন্ঠে উচ্চারিত করেছেন-

“-জানি তুমি এই জীবনের পথ মম

করনি কোমল সবুজ শ্মপে ঢাকি,

দুর্গম পথের যাত্রী করেছ মোরে

সে মোর গর্ব কেমনে লুকায়ে রাখি।”

**সহায়ক গ্রন্থঃ-**

অভিজিৎ সেন ও যশোধরা বাগচী (সম্পাদিত) “শতবর্ষে আশালতা সেন” (১৯৯৯)।

**বিবেক-মানসে আদর্শ নারী : আজকের পরিপ্রেক্ষিতে**

ড. সুমিতা চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

বিবেকানন্দ-মানসে আদর্শ নারী সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী – তিনি বলেছেন, “হে ভারত, ভুলিও না – তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী;” এবং তাঁর দৃষ্টিতে নারীর আদর্শ মাতৃত্বে -“ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব – সেই অপূর্ব, স্বার্থশূন্য, সর্বংসহা, নিত্য ক্ষমাশীলা জননী।” শুধুমাত্র ভারতে নয়, সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখে নারীর আদর্শ ও আদর্শ নারীর রূপকে এমন সুস্পষ্ট ভাবে বিবেকানন্দ-পূর্বে আর কেউ বলেননি। এই আদর্শ বাণী বিবেকানন্দ-সমকালেও যেমন সত্য ছিল, আজকের যুগেও তা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। স্বামীজীর এমন জ্বলন্ত বাণী আমাদের সামনে, তবু আমরা ভ্রমিত। আমরা মেয়েরা অনেকসময় নিজেরাই খুঁজে পাইনা নিজেদের আদর্শকে। বুঝে উঠতে পারিনা ঠিক কোন্‌ পথে চললে আদর্শ নারী রূপে নিজেদের গড়ে তোলা সম্ভব। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের হাত ধরে আধুনিক ভারতে মেয়েদের সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে যে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে বহু সমাজবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার কারণ, সকলেই অনুভব করেছিলেন যে সুস্থ সশক্ত সমাজ গঠনের জন্য নারী –পুরুষকে সমানভাবে তাদের দায়িত্ব নির্বাহ করতে হবে। নারীমুক্তির অর্থ শুধুমাত্র কিছু সামাজিক প্রথা ও বন্ধন থেকে মেয়েদের মুক্তি নয়, তার প্রকৃত অর্থ নারীর মানসিক মুক্তি – একথা বিবেকানন্দের পূর্বে আর কোন সমাজসংস্কারক বলেননি। তারপর থেকে আমরা এগিয়ে এসেছি আরও অনেকগুলো বছর - অনেকগুলো যুগ। কিন্তু আজও আমাদের সমাজে বহু ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য রয়ে গেছে। আমরা তা থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হতে পারিনি। সমগ্র বিশ্বে এখনও মেয়েদের স্বাধীনতা ও সুরক্ষার অভাব দেখা যায়। নারী মুক্তি ও মহিলা-সশক্তিকরণ নিয়ে যতই আন্দোলন চলুক না কেন, প্রতিনিয়ত তা আমাদের চোখের সামনেই ধ্বস্ত হয়ে চলেছে। তাই আজকের যুগেও বিবেকানন্দের নারী বিষয়ক চিন্তাভাবনার পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন। তাঁর বাণীকে সম্মুখে রেখে পৃথিবীর নারীরা যখন তাদের আদর্শকে নিয়ে পরিপূর্ণ রূপে গড়ে উঠবে, তখনই ঘটবে প্রকৃতপক্ষে নারী-জাগরণ ও নারী-সশক্তিকরণ।

বিবেকানন্দের ইহজীবনকাল খুব সামান্য। তিনি তাঁর অল্প জীবনকালে কর্মকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম, উচ্চ-নীচ, নারী-পুরুষের ভেদাভেদের ঊর্ধে কেবলমাত্র মানুষ হিসেবে মানুষকে তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন, যে কোন দেশের উন্নয়নের জন্য সার্বিক উন্নতি প্রয়োজন। তিনি জানতেন ‘ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার ঊত বা কুমারী’। তাই খুব সহজভাবে তিনি বলতে পেরেছিলেন, “আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি ? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা। শরীরাভিমান ছেড়ে দাঁড়া।” শুধু ঘোষণা করা নয়, ব্যবহারিক জীবনেও তিনি নিজ-আচরণের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণ করেছিলেন। তাঁর মতে দেশের উন্নতি সাধন তখনই সম্ভব, যখন অন্যান্য দিকের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মেয়েদেরও উন্নতি ঘটবে। প্রাচীন ভারতে অর্থাৎ বৈদিক যুগে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ছিল বলে জানা যায়। সেকালে বহু নারী ঋষি পদের অধিকারী ছিলেন। সমাজে তাঁদের উচ্চ স্থান ছিল। উপনিষদের যুগ পর্যন্ত নারীর এই মর্যাদা অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু বৌদ্ধযুগ থেকে সমাজে মেয়েদের স্থান নিম্নগামী হতে থাকে। বৈদিক যুগে যে নারী ছিল মন্ত্রদ্রষ্টা, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সেই নারীকে সাধনপথের সবথেকে বড় বাধা রূপে চিহ্নিত করা হল। সন্ন্যাসীরা তাঁদের সাধনার পথে মেয়েদের পরিহার করলেন। এল আধুনিক যুগ। সমাজের বহুল পরিবর্তন ঘটল। বিদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির প্রভাবে উন্মুক্ত চিন্তাধারার বিকাশ হল। কিন্তু মেয়েদের অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন ঘটল না। বরং তারা ধীরে ধীরে হয়ে উঠল অন্তঃপুরবাসিনী। বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী। প্রচলিত মতে তাঁর মেয়েদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলার কথা। কিন্তু স্বামীজি সেই নিয়মকে ভেঙেছেন কঠোর যুক্তি দিয়ে। কারণ, কেবলমাত্র সাধনার দ্বারা নিজের মুক্তি তাঁর জীবনের লক্ষ্য নয়, তিনি সমগ্র মানব জাতির উন্নতির কথা ভেবেছিলেন। তাই তিনি নারী আর পুরুষ – উভয়ের সমান উন্নতি কামনা করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন,“... এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।” (বাণী ও রচনা, ৭ খণ্ড,পৃষ্ঠা ২৪৪)

মেয়েদের শিক্ষা, স্বাধীনতা, অধিকার নিয়ে যে যুক্তি বিবেকানন্দের মনে প্রথম থেকেই সাড়া জাগিয়েছিল তা আরও মজবুত হল প্রথমবার বিদেশের মাটিতে পা রাখা মাত্রই। তাঁর চোখে আমেরিকান নারী এক অদ্ভুত বিস্ময় রূপে ধরা দিল। অন্তঃপুরবাসিনী ভারতীয় মেয়েদের থেকে এই মেয়েরা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নারী তার শিক্ষা দ্বারা কতখানি শক্তিমতী হতে পারে, তা তিনি আমেরিকায় এসেই প্রত্যক্ষ করলেন। বিদেশের সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে তিনি বহু নারীর থেকে সাহায্য, সহানুভূতি এবং উৎসাহ পেয়েছিলেন। তাঁরা মাতা ও ভগিনীর রূপে স্বামীজির প্রতি অনাবিল স্নেহ বর্ষণ করেছিলেন। মেয়েদের সেই শক্তিমতী রূপ তিনি ভারতেও দেখতে চেয়েছিলেন। তবে তিনি বুঝেছিলেন, প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের আদর্শে ভিন্নতা রয়েছে। প্রাচ্যে মাতৃত্বকে উচ্চস্থান দেওয়া হয়, পাশ্চাত্যে নারী জায়ারূপে সমাদৃত। তিনি মনে করতেন, এই উভয় আদর্শের সংমিশ্রণে নারী জাতির যথার্থ আদর্শ নিহিত। তিনি তাঁর জীবনকালে ‘সংঘজননী’ সারদা দেবী ও ভগিনী নিবেদিতার মিলনের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিতও করেছিলেন। নিবেদিতার প্রতি স্বামীজির আশীর্বাণী ছিল –

“মায়ের হৃদয় আর বীরের দৃঢ়তা

মলয় সমীর যথা স্নিগ্ধ মধুরতা,

.....................

ভবিষ্যৎ ভারতের সন্তানের তরে

সেবিকা, বান্ধবী, মাতা তুমি একাধারে।”

ভারতীয় সমাজ এখনও পরিবারকে ঘিরেই গড়ে ওঠে। সমাজ যতই পিতৃতান্ত্রিক হোক্‌ না কেন, পরিবারের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কোন না কোন নারী। তাই দেশের নারী যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে সমাজ বা রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব নয়। আপন ব্যক্তিসত্তা ও নারীধর্মের ওপর বিশ্বাস না জন্মানো পর্যন্ত মেয়েরা তাদের প্রাপ্যস্থান কখনই অধিকার করতে পারবে না। মেয়েদের পূর্ণ জাগরণের জন্য প্রথমে তাদের মনে গভীর আত্মবিশ্বাস জাগা প্রয়োজন - একথা ভারতের নারী জাগরণের প্রথম যুগেই স্বামীজি বুঝেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম প্রচার করিলে আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, এক মহান তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে।”

শিক্ষার যে বিপুল শক্তি আছে সে কথায় স্বামীজি বিশ্বাস করতেন। তিনি জানতেন, শিক্ষার দ্বারাই সকল সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। কিন্তু সে শিক্ষা যেন কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ না হয় ; যে শিক্ষায় চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ান যায়, আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, তাকেই তিনি প্রকৃত শিক্ষা বলেছেন। তাই সর্বসাধারণের শিক্ষার সঙ্গে তিনি নারীশিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তবে সে শিক্ষা পাশ্চাত্যের অনুকরণ নয়, সেই শিক্ষায় ভারতীয় আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতা থাকা চাই। তিনি বলেছেন, “ধর্মকে কেন্দ্র করে স্ত্রী শিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা গৌন হবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন...নতুবা তার কাজে গলদ বেরোবেই।”(বাণী ও রচনা, ৯ খণ্ড,পৃষ্ঠা ২০৫)। স্বামীজি ভারতীয় মেয়েদের সম্মুখে এক নতুন আদর্শের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। যে পথ তাদের এক উচ্চ জীবনের সন্ধান দিতে সমর্থ। সেই শিক্ষা থাকবে বীরত্ব ও আধ্যাত্মিকতার মিলন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, “আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপেনে ভাবেই শিক্ষা করে আসছে। বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এ সময়ে তাদের মধ্যে self-defence শেখা দরকার হয়ে পড়েছে। দেখ দেখি, ঝাঁসির রানী কেমন ছিলেন।” এই শিক্ষা মেয়েদের স্বাধীনতার পথকে সুগম করতে সাহায্য করবে। কিন্তু তা তখনই যথার্থ শিক্ষা হয়ে উঠবে, যখন তা দ্বারা মেয়েদের মনে আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটবে। বাস্তব জীবনে কোন্‌ পথ সে বেছে নেবে তার নির্বাচন আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকলেই মেয়েদের পক্ষে স্থির করা সহজ হবে। তারপর যে পথই সে গ্রহণ করুক না কেন, তা তাকে শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করবে। তিনি ভারতের পুরুষ সমাজের সামনে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, “মেয়েদের বিষয়ে পুরুষের হস্তক্ষেপের অধিকার তাদের শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত – “নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ যোগ্যতা-লাভে সমর্থ”। (বাণী ও রচনা, ৯ খণ্ড,পৃষ্ঠা ৪৭৯) তিনি আরও বলেছেন –“তোমাদের নারীগণকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাহারাই বলিবে, কোন্‌ জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক।”(বাণী ও রচনা, ১০ খণ্ড,পৃষ্ঠা ২২১)। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তিনি কেবলমাত্র মানবজাতির সশক্তিকরণের কথা ভেবেছিলেন - “আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, আমি এমন একটি যন্ত্র চালাইয়া যাইব – যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ ভাবরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তারপর পুরুষই হউক আর নারীই হউক – নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য রচনা করিবে”। (বাণী ও রচনা, ৬ খণ্ড,পৃষ্ঠা ৩৯১)

উনিশ শতকে এসে ভারতীয় মেয়েদের অন্তঃপুরের বাইরে প্রথম পদধ্বনি শোনা যায়। বিশ শতক পর্যন্ত পুরুষপ্রধান ভারতীয় সমাজে মেয়েরা নিজেদের অস্তিত্বকে চিহ্নিত করে। এখন একুশ শতক। সমাজের সব ক্ষেত্রেই মেয়েদের অবাধ বিচরণ। আধুনিক নারী অনেক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী। ঘর ও বাইরের মধ্যেকার দূরত্ব মিটেছে অনেকখানি। বৃহত্তর জগতে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। সমগ্র বিশ্ব এসেছে হাতের মুঠোয়। মেয়েরা শিক্ষিত হয়েছে। বিদেশের সভ্যতা সংস্কৃতি ধীরে ধীরে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে। যুগের আদর্শকে উপেক্ষা করা যায় না। এই বহু চাকচিক্যের মধ্যে তারা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা আদর্শ নির্ণয়ে অসমর্থ হয়ে পড়ছে। কারণ, সমকালের সমাজ-পরিস্থির সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে গিয়ে একাধিক পথ ও আদর্শ সম্মুখে উপস্থিত। এক্ষেত্রে নারীর আদর্শের প্রকৃত অনুধাবন করা সহজসাধ্য নয়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং পুরুষের সমান অধিকার প্রাপ্তি। এককথায় বলা যায়, এদেশের নারী তার নারীত্বের আদর্শকে ভুলে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন স্বামীজি একথা শতবর্ষ আগেই বুঝেছিলেন। এই সঙ্কটের থেকে মুক্তির জন্যই তিনি আধাত্মিক শিক্ষার কথা বলেছিলেন। তিনি জানতেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য নারী-পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন। তাই একটি শ্রেষ্ঠ ও আর একটি হীন হতে পারে না। সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার থেকে নিজেদের মুক্ত করে নারীকে স্বমহিমায় নিজ ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, সেখানেই তার গৌরব। মেয়েদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাকে স্বামীজি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্যের যা কিছু ভালো তাকে অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তা নিজেদের স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে নয়। স্বামীজি এই ধারণা পোষণ করতেন যে, অতীত যুগের যে সব মহীয়সী নারী ছিলেন, আগামীকালের নারীর মহত্ত্ব তাকে অতিক্রম করে যাবে। আগামী যুগের নারীর মধ্যে থাকবে একাধারে বীরোচিত দৃঢ় সংকল্প ও জননীর স্নেহ-কোমল হৃদয়। নারী হবে পবিত্রতা, শক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাটকে মদ্যপানের প্রভাব

টুম্পা ব্যাপারী

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা এবং পাশ্চাত্য সমাজ জীবনের সংস্পর্শে আসার ফলে বাঙ্গালী সমাজ জীবনে এক নতুন কুপ্রথার জন্ম নেয় তা হল মদ্যপান। সে যুগের সমাজসংস্কারকগন যেমন সমাজের কুপ্রথা দূরীকরনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন তেমনি ইংরেজ দৌলতে নতুন করে কিছু কুপ্রথার ও জন্ম হয়েছিল বাংলায়। হিন্দু নীতিশাস্ত্রে মদ্যপান চিরকালই নিন্দার বিষয় এবং একপ্রকার বিশেষ পাপ বলে প্রতিপন্ন হয়। বলা বাহুল্য প্রাচীন এবং মধ্যযুগে নিন্মশ্রেনী এবং হীন চরিত্রের মধ্যে এই পাপ সীমাবদ্ধ ছিল। বিপদ ঘটল ঊনবিংশ শতাব্দীতে, যেখানে নিন্মশ্রেনী নয় উচ্চশ্রেনীর চরিত্রদের মধ্যে এর প্রবলতা দেখা দিল। ইউরোপীয় আচার আচরণ আনুসরণ করতে গিয়ে মদ্যপান ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করতে লাগল। কিভাবে মদ্যপান বাঙ্গালী পরিবারের শুধুমাত্র বাইরে নয় ভিতরটাকে নাড়া দিয়েছিল তা সেই সময়ে লেখা নাটক এবং প্রহসনগুলি আলোচনা করলে বোঝা যাবে।

প্রথমেই আসা যাক প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘মদ খাওয়া বড় দায় , জাতি রাখার কি উপায়’ নামক গ্রন্থের আলোচনায় । সমকালীন কলকাতার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন – ‘কলিকাতায় যেখানে যাওয়া যায় , সেখানেই মদ খাবার ঘটা। কি দুঃখী, কি বড় মানুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই মদ্য পাইলে অন্ন ত্যাগ করে’। রাজকোষের আয় বাড়ানোর জন্য ইংরেজ সরকার অতি সস্তায় মদ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল ফলত কলকাতার অলি-গলিতে মদের দোকান তৈরি হল এমনকি মফঃস্বলে ছোট বড় গঞ্জ, হাট, বন্দরে মদ বিক্রির সুব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। ফলত দেখা গেল বাড়ির কর্তা নয় সেই সর্বনাশী মদ কুলস্ত্রীকেও ছুঁয়ে নিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক এবং প্রহসন গুলি নিন্মে আলোচিত করা হল। মধুসূদন দত্তের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’- প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে। নাটকে কর্তা মহাশয় পরম বৈষ্ণব। তার ছেলে নববাবু কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করে। আর কর্তা মহাশয় বেশীরভাগ সময় বৃন্দাবনে বাস করেন। একসময় ছেলেকে চোখে চোখে রাখার জন্য তিনি কলকাতায় বাস করতে লাগলেন কিন্তু তা সব সময় সম্ভব না হয়ায় তিনি এ কাজে শিষ্যকে নিয়োগ করেন। তার মুখ থেকে যা শুনলেন তা শুনে তিনি সেখান থেকে পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরে গেলেন। নববাবুর চরিত্র যেদিকে এগোচ্ছিল তা এমন –একদিন বোনের মুখে চুমু খেয়ে বলেছিলেন, এতে দোষ কি? সাহেবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আর আমরা কল্লেই কি দোষ হয়?’ এর পর থেকে বাড়ির কেউ তার সামনে আসে না। এমনকি সেদিন মত্ত অবস্থায় তার স্ত্রীর সাথে বারবনিতার মত ব্যবহার করেছিল। বাবাকে ‘মদ ল্যাও’ বলে ডেকেছিল। নববাবু চরিত্রের মধ্য দিয়ে যেমন নব্য বাংলার পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি কর্তা মহাশয় সেকালের সমাজের আর এক দিকের পরিচয় বাহক। তিনি ধর্মভীরু ও পরম বৈষ্ণব। তাই কলকাতার বাস উঠিয়ে তিনি সবাইকে নিয়ে বৃন্দাবনে যেতে চেয়েছেন। এ ছাড়াও আছে নারী চরিত্র। তাদের তাস খেলা, মদ্যপান এখানে কুরুচিকর মনের পরিচয় বহন করে।

‘একেই কি বলে সভ্যতা’ প্রহসনের অনুকরণ করে দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬৬ সালে ‘সধবার একাদশী’ নামে একটি প্রহসন রচনা করেন। তাঁরও রচনার উদ্দেশ্য সেই মদ্যপানের কুরূপের প্রকাশ। কলকাতার ধনীর ছেলে অটলবিহারী ইংরেজি স্কুলে কয়েকদিন পড়াশুনা করে স্কুল ছেড়ে দেয়। তারপর সঙ্গী জুটিয়ে ঘুরে বেড়াত এবং মদ পান করত। সঙ্গীদের মধ্যে প্রধান ছিল নিমচাঁদ। সে মদ খাওয়ার অভ্যেস আগে থেকে রপ্ত করেছিল। বারবনিতা কাঞ্চনের সাথে ঝামেলা হওয়ায় অটল প্রতীজ্ঞা করে বারবনিতা নয় ভদ্র বাড়ির বউকে সে বার করে বাগান বাড়িতে রাখবে আর তা করে গিয়ে সে নিজের বউকে ভুল করে বাইরে বের করে আনে। যদিও তাতে তার এতটুকু অনুশোচণা হয় না। মদ্যপান মানুষকে নয় তার অন্তঃরাত্মাকেও পর্যন্ত মেরে ফেলেছে ভীষণ ভাবে তা নাট্যকার নতুন করে দেখালেন।

মদ্যপান সমাজে ভীষণ রূপ ধারন করেছে , কিছু মানুষ বুঝে তার প্রতিকার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এর জন্য কিছু সাধারন প্রতিষ্ঠান স্থাপন হয়েছিল যেমন–প্যারীচরণ সরকার প্রতিষ্ঠিত –Temperance Society বা ‘সুরাপান নিবারণী সমিতি’। এর প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পর দীনবন্ধুর ‘সধবার একাদশী’ নাটকটি প্রকাশিত হয়। এ নাটকের অন্যতম চরিত্র নিমচাঁদ যে সমস্ত নাটকটিকে প্রভাবিত করেছে। ধনী পুত্র অটল মেঘনাথবধ কাব্য কিনেছে শুনে নিমচাঁদতাকে বলছে –

‘ওর ভালমন্দ তুমি বুঝিবে কি? তুমি পড়েছ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে দাশরথি, তোমার ঠাকুরদা পড়েছে কাশীদাস, তোমার হাতে “মেঘনাথ, কাঠুরের হাতে মাণিক\_\_মাইকেল দাদা বাংলার মিলটন .’

মদ্যপানকে কেন্দ্র করে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ‘চার ইয়ারে তীর্থযাত্রা’ নামে একটি নাটক রচনা করেন। যেটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। গোপালচন্দ্র, হরিহর, নিতাই ও শ্যামলাল এই চারজন পরম ইয়ার বা বন্ধু। এদের মধ্যে গোপাল মদ্যপ, হরিহর অহিফেন-সেবী, নিতাই গুলিখর, শ্যামলাল গাঁজাখোর। সম্ভ্রান্তপরিবারের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও এক সময় তাদের দশা ভিখীরিতে পরিনত হয়। অবশেষে তারা ভাবে যে বড়লোকের বাড়ি যাবে এবং সেখানে গিয়ে তাদের মদ খাওয়ানো শেখাবে তাহলে তাদের মদ খাওয়ার জন্য আর টাকা লাগবে না। তাদের কথা শুনে সম্ভ্রান্ত বাবুদের অবস্থা করুন হয়ে উঠল। শেষে তাদের বৃন্দাবনে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল।

জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কর ১৮৭০ সালে ‘সুধা না গরল’ নামে একটি প্রহসন লেখেন। মানুষ আর পশুদের মধ্যে যে কোন পার্থক্য নেই সেটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। উকিল বিধুবাবু ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখিয়েছেন, হিন্দুদের দেবতা মানেন না এবং মুসলমানের তৈরি রুটি খান না। তাঁর মতে এগুলি দেশের কুসংস্কার যা তাড়াতে না পারলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। রামেশ্বরবাবু তাঁর বন্ধু, তার ও একমত। বিধুবাবুর আর এক বন্ধু গনেশবাবু তিনি মদ্যপান করেন, স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করেন, পরের বউকে দেখে আকর্ষিত হন। বিধুবাবুর বৈঠকখানায় মদ্যপান চলে। নলিনবিহারী, শম্ভু, গোলাপী এদের আগমনে নরক গুলজার হয়। নাটকের শেষে শম্ভূবাবুর স্ত্রী স্বামীকে মদ ছাড়তে বলায় বিনিময়ে রতনচূর চায়। শম্ভুবাবু স্ত্রীকে লাথি মারেন এবং তাতে তার স্ত্রী মারা যান। আর গনেশবাবু পরস্ত্রী লোভে খুব বিপদে পড়েন এবং দেশত্যাগী হন।

রামচন্দ্র দত্তের ‘মাতালের জননী বিলাপ’ নাটকটি ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। মদ্যপানে বুদ্ধি নষ্ট হয় সেটি দেখানো এ নাটকের উদ্দেশ্য। হরিশবাবু কোলকাতার একজন সম্ভ্রান্ত লোক। তিনি সর্বত্র মদ্যপানের বিরুদ্ধে বলেন অথচ নিজে মদ খান। প্রত্যহ প্রতীজ্ঞা করেন তিনি আর মদ খাবেন না কিন্তু মদ দেখলে নিজেকে সংবরণ করতে পারেন না। একদিন পতিতা কামিনীর বাড়ি যাওয়ার সময় মা সাবিত্রী দেবীর কাছে টাকা চান। তিনি দিতে অস্বীকার করলে হরিশবাবু বলেন – মদ খাওয়া একটা সভ্যতার চিহ্ন আর ডাক্তারেরা বলেন যে মদে অনেক উপকার আছে। কিন্তু তার মা যখন এর প্রতিবাদ করেন তখন তিনি মাকে লাথি মারেন ।এবং টাকার বাক্স নিয়ে পালিয়ে যান। তবে নাটকের শেষে দেখা যায় যে হরিশবাবুর চরিত্রের অধঃপতন দেখে সাবিত্রী দেবী কাঁদতে থাকেন আর বলেন যে মদ তার সর্বনাশের জন্য ইংরেজরা এদেশে এনেছেন। মনে মনে প্রার্থনা করেন যে সেইদিন করবে আসবে যেদিন মদকে বিষ বলে আর গ্রহন করবে না।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত ‘বিধবার দাঁতে মিশি’ প্রহসনটি ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয় ।কাহিনী এমন শিবপুরের জমিদার কমলাকান্তের মৃত ভাইয়ের দুটি ছেলে শারদা ও বরদা। শারদা নিখোঁজ। বরদা প্লান করে সে কমলাকান্তকে পুড়িয়ে মারবে কিন্তু কমলাকান্ত তা জানতে পেরে বিধুকে তাড়িয়ে দেয়। বরদার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী এবং গোরাচাঁদের স্ত্রী যামিনীর দুঃখ যে তাদের স্বামীরা রাতে তাদের সাথে থাকে না। এদিকেশরদা না থাকার জন্য গোরাচাঁদের সাথে সৌদামিনীর একটা অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হয়। এসব দেখে কমলাকান্ত কাশীতে চলে যান। গোরাচাঁদ পরিকল্পনা করে বড়দাকে মদ খায়িয়ে মারার কথা ভাবে ,কমলাকান্তের অবর্তমানে সে সৌদামিনীকে ভোগ করতে পারবে এবং সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করতে পারবে। কিন্তু দেখা যায় বরদা মদ্যপানে মারা যায়, সৌদামিণীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় যদিও ঘটনাক্রমে শারদার সাথে সৌদামিনীর মিলন হয়। আর নিজের কাজের জন্য তাকে বিষ মিশ্রিত খাবার খেয়ে মরতে হয়।

রাজকৃষ্ণ রায় (জ্ঞানগর্ভ শিক্ষামানী) রচিত ‘দ্বাদশ গোপাল’ নামে প্রহসনটি ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। কোন কোন উৎসব উপলক্ষে শিক্ষিত সমাজের মদ্যপান চরম আকার নিত। মাহেশে দ্বাদশ গোপাল দর্শন উপলক্ষে কোলকাতার বাবু সমাজের মদ্যপান এবং তাদের ব্যভিচার রচনা করা এ নাটকের উদ্দেশ্য। কোলকাতার চারজনবাবু এক পতিতাকে নিয়ে নৌকাযোগে মাহেশে দ্বাদশ গোপাল দেখতে গিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন নন্দলাল যে নিজের বাড়ির শালগ্রাম শিলার সোনার পৈতে চুরি করে পরে বিক্রি করে মদ কিনেছে, স্ত্রীকে মেরে তার গলার হার নিয়েছে। আর একজন বিধুভূষণ সে মাইনের টাকায় মদ কিনে খায় পরিবারে একটি টাকাও দেয় না। শেষে মদকে কেন্দ্র করে এক মহা সোরগোল সৃষ্টি হয়। তখন পুলিশের লোক আসে এবং আসল কারন জেনে তাদের কিছু সদুপদেশ দেন। এটি নাটক বা প্রহসন না হলেও সেই সময়ে মদ সমাজ তথা ব্যক্তি জীবনে কিভয়ঙ্কররূপ নিয়েছিল তা দেখানো হয়েছে।

মদ্যপানকে কেন্দ্র করে লেখা আর একটি নাটক ‘এই এক প্রহসন’ যদিও লেখকের নাম পাওয়া যায় নি। এটি ১৮৮১ সালে প্রকাশিত হয়। বিষয়বস্তু এই -বামাপদ কেরানীর চাকরী করে। একদিন বই এর দোকানে গিয়ে বই কিনতে চাইলে দোকানদার ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ নামে একটি বই দেয়। তখন তিনি উল্টে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করেন লেখকদের বুড়োদের উপর এতো রাগ কেন। সেখানে আর এক কেরানী হলধরবাবুর সাথে তার দেখা হয়। এবং তার সঙ্গ লাভে বামাপদবাবু মদ্যপান এবং পতিতা গৃহে যাওয়া শুরু করেন। পড়ে অবশ্য বামাপদবাবুর বন্ধুকে উপদেশ দেন এবং তাতে বন্ধু হলধর বাবু নিজের ভুল বুঝতে পারেন।

মদ্যপান বিষয়ক রা একটি নাটক গিরিশ চন্দ্র ঘোষের ‘প্রফুল্ল’। নাটকটির মধ্য দিয়ে সমসাময়িক বাংলা সমাজের কালিমাময় রূপকে প্রকাশ করা হয়েছে।নাটকের নায়ক চরিত্র যোগেশের মধ্য দিয়ের মদ্যপানের ভয়ঙ্কর রূপকে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া নাটকের অন্য চরিত্র জ্ঞানদার সংলাপের মধ্য দিয়ে মদ্যপানের নিন্দা শোনা যায়। প্রফুল্ল জখন জ্ঞানদাকে বলল,’ দিদি, তুমি খেতে দাও কেন, দিদি?’ জ্ঞানদা উত্তরে বলেছিল ,-‘আমি কি করব বোন, সহরে অলিতে গলিতে শুঁড়ির দোকান, কিনে খেলেই হলো। আহা! কোম্পানির রাজে এত হ’চ্ছে, যদি মদের দোকানগুলি তুলে দেয়, তা হলে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করে ,আর লোকে ভাতার-পুত নিয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দে ঘর করে। ‘যোগেশ একদিন মাতলামি করতে করতে বলে ফেলল- ‘সাবাস, সাবাস, উকিল কি চিজ...আমার মা রত্নগর্ভা, একটি মাতাল,একটি উকিল, একটি চোর। ‘(২/৪)। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোলকাতার নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠার ফলে ইংরেজ অনুকরণে মদের সাথে মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রামে যে সমস্যা পঞ্চায়েত কিংম্বা গ্রামের বয়স্করা করতেন তার মীমাংসা করার জন্য মামলা মোকদ্দমার সাহায্য নেওয়াতে সাধারণ মানুষের কি দুর্বস্থা হয়েছিল তা এ নাটকে দেখানো হয়েছে।

‘প্রফুল্ল’ নাটক রচিত হওয়ার পর গিরিশচন্দ্রের অনুকরণে অনুরূপ আরও বহু নাটক ও প্রহসন রচিত হয়। তার মধ্যে একটি ‘প্রেমের নকসা’ বা ‘রগড়ের চাঁচি’ (১৮৯৯)। নাটক রচনা করেন বিপিন বিহারী চট্টোপাধ্যায়। বিষয়বস্তু এমন –রমেশবাবু নেশাখোর জমিদার, দিন-রাত বন্ধুদের সাথে ঘুরে বেড়ান। তার ছেলে অঙ্গদ নেশাখোর পদ্মলোচনের সাথে ঘুরে বেড়ায়। এই পদ্মলোচনের উপদেশে অঙ্গদ জীবিত বাবার শ্রাদ্ধ করার ব্যবস্থা করে, উদ্দেশ্য ছিল বাবার সমস্ত সম্পত্তি পাবে এবং নিশ্চিন্তে মদ খাবে। কিন্তু রমেশবাবু সব জানতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করেন –‘বেফাঁক বাঁশটায় ঘুণ ধরান’।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পর যখন বিংশ শতাব্দীতে মানুষ প্রবেশ করল তখন বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য গ্রহন এই নীতি অনুসরণ হতে লাগল আর শিক্ষিত মানুষের মনে আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত হওয়ার কারণে মদ্যপান অনেকাংশে কমে গেল ।

**সৃষ্টির বিকল্প সন্ধানঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ**

মৃন্ময় প্রামাণিক

গবেষক, তুলনামূলক সাহিত্য ও অনুবাদ চর্চা

হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়

“শক্তি চট্টোপাধ্যায় যখন কবিতা লিখতে পারতেন না, তাঁর নিজের ভাষায়, ‘কবিতারা যখন ধরা দিত না’, তখন হার না মেনে তিনি অনুবাদ কর্ম নিয়ে বসতেন। কখনও ভগবদগীতা, কখনও বিদেশী কবিতা, কখনও বা ভারতীয় কবিদের রচনা অনুবাদ করেছেন শক্তি।” (প্রচ্ছদ, অগ্রন্থিত পদ্য)

উদ্ধৃত এই লেখাটি থেকে এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই একটি কথা থেকে তাঁর অনুবাদ চিন্তা বিষয়ে একটি ধারণা পাওয়া যায়। কথা এখান থেকে শুরু হতে পারে। যখন নিজের মন আর মননের জারনে কবিতা ধরা দিত না কলমের ডগায় তখন মনপিয়াস মেটাতে তিনি অনুবাদ করতে বসতেন। শক্তির কাছেব্যাক্তির সৃজনী তৃষ্ণার বিকল্প অনুসন্ধান হল অনুবাদ।

অনুবাদ কি সত্যি সত্যি সৃজন নাকি নিছকই একজন স্রষ্টার পিছন পিছন আজ্ঞাবহের মত হেঁটে যাওয়া? এ নিয়ে তর্ক হয়েছে বিস্তর। ভারতীয় সংস্কৃতিতে অনুবাদ ভাবনার ইতিহাস বা প্রাক ঔপনিবেশিক চিন্তন আমরা যদি দেখি তাহলে লক্ষ্য করবো যে অনুবাদকে ভারতীয় সংস্কৃতিতে সবসময়ই একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অনুবাদ কতটা বিশ্বস্ত বা বিশ্বস্ততার প্রশ্নটি অনুবাদের ক্ষেত্রে কেন উঠবে অনুবাদকে সাহিত্যের পরিমন্ডলে দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক হিসেবে দেখার প্রবণতা ইত্যাদি ব্রিটিশ পরবর্তী চিন্তার ফসল। প্রতীচ্যে অনুবাদকে যেখানে সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে প্রাচ্যে সেখানে এসব প্রশ্নে সময় ব্যয় না করে শিল্প হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ঐ পাঁচটি শব্দের একটি কথা এই প্রসঙ্গের অবতারণা প্রাসঙ্গিক করে তোলে। কবিকে সৃষ্টির বীজ যখন নিজেকেই বপন করতে হয় তখন তো নিজের ভেতরটাতে একটা তোলপাড় চলে, এই তোলপাড়কে সবসময় কবি বহন করতে পারেননা, তখন একটা সৃষ্টির গঠন চোখের সামনেবলা ভালো মনের সামনে থাকা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সেই গঠন অন্যকেউ তৈরি করে দিয়েছে, বপিত বীজের জমিতে ফসল ফলানোর দায়িত্ব এবার তো অনুবাদকের। শক্তি অনুবাদকে এইভাবেই দেখেছেন। সৃষ্টি, কিন্তু সেই সৃষ্টি হল যুগ্ম সৃষ্টি। অনুবাদিত টেক্সট তাই ঠিক অনুবাদকের শুধু নয়, তা মূল স্রষ্টারও বটে, একটি কাঠামোর ওপরে একটি সৃষ্টি। একটি কবিতা যখন অনুবাদের জন্য গৃহিত হয় তখন সেই সৃষ্টি গৃহীত হয় একটি কাঠামো হিসেবে পুনঃসৃষ্ট হওয়ার জন্য। আত্ম সৃজনের বিকল্প অনুসন্ধানই হল শক্তির কাছে অনুবাদ।

বাংলায় অনুবাদের জন্য একটি শব্দ অনেক সময় ব্যাবহার করা হয় তাহলো ‘অনুসৃজন’ বা ‘অনুসৃষ্টি’। বাংলা সাহিত্যের সমালোচকরা এই শব্দটি ব্যাবহার করেন একটি বিশেষ ধরনের অনুবাদের ক্ষেত্রে, যদি অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল পাঠের শব্দ বা বাক্যকে অনুবাদের একক হিসেবে ধরে শব্দানুসারী বা বাক্যানুসারী অনুবাদ করা হয় তাহলে সেখানে তারা অনুবাদ শব্দটিই ব্যাবহার করেছেন কিন্তু যখন অনুবাদ মূল পাঠকে অতিক্রম করে যায়, কথায়, গল্পে, চরিত্রে, গঠনে, ভাবে, প্রকাশে, ছন্দে, অলঙ্কারে তখন অনুসৃজন শব্দটি ব্যাবহার করেছেন তাঁরা। যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গালিবের গজল অনুবাদকে তাঁর অনুসৃজন বলবেন না কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশিদাসী মহাভারতকে তাঁরা অনুসৃজন বলবেন।যদিও ভারতীয় অনুবাদ তত্ত্বের উত্তরাধিকার বহন করতে গেলে এই শব্দটির অস্তিত্ত্ব রাখা যায়না। অনুবাদ হল একটি টেক্সটের পুনর্জন্ম এবং সেটা নতুন জন্ম, মানে নতুন সৃষ্টি। আজকের অনুবাদ তাত্ত্বিকরা বলবেন অনুবাদের একক শব্দ বা বাক্য নয়, সমগ্র টেক্সটটিই অনুবাদের একক এবং অনুবাদ শব্দানুসারী বা বাক্যানুসারী যায়ই হোক না কেন সেটা একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি কারণ একটি অন্য ভাষায় এবং অন্য সংস্কৃতিতে আরেকটি অন্য ভাষা বা সংস্কৃতির টেক্সটকে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এবং তা করতে গিয়ে কিছু নতুন ইমেজ, নতুন চিনহ অনুবাদিত ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে সংগ্রহ করতে হচ্ছে, নতুন শব্দ তৈরি করতে হচ্ছে, নতুন ভাবে ভাব নির্মান করতে হচ্ছে, ঠিকঠাক প্রতিশব্দ পাওয়ার অভাবে অনুবাদিত ভাষায় বিকল্পের অনুসন্ধান করতে হচ্ছে তাই যেকোনো অনুবাদই একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি।

‘কবিতারা যখন ধরা দিত না’, তখন শক্তি চট্টোপাধ্যায় অনুবাদ করতেন অন্য ভাষার কবিতা। অর্থাৎ কবি যখন নতুন বস্তু, বিষয়, শৈলী নিয়ে ভাবতে পারতেননা তখন তিনি অন্য ভাষার কবিতা অনুবাদ করতেন। তাহলে সৃষ্টির একটি উপাদান পাওয়া গেলো যেটাকে গড়ে পিটে নিতে হবে, শুধু ভাষান্তর নয়, একটি সমগ্র রূপান্তর। অনুবাদ হল একটি পাঠের সমগ্রের রূপান্তর। এই রূপান্তরই সৃষ্টি। শক্তির কথা ধরে এগোতে গেলে এই রূপান্তর একটি মানসিক প্রক্রিয়া। সৃষ্টির তাড়নায় যে অন্তর্দাহ চলছে সেখান থেকে তো মুক্তি পেতে হবে কবিকে তাহলে কবি মুক্তির পথ হিসেবে যখন অনুবাদকে বেছে নিচ্ছেন তখন অনুবাদ তো একটি মুক্তিমার্গ এবং সৃষ্টির সম শান্তি তিনি পাচ্ছেন তাহলে অনুবাদকে কারো যদি সম্পূর্ণ সৃষ্টি হিসেবে মেনে নিতে খুবই সমস্যা থাকে শক্তির তত্ত্ব অনুযায়ী অনুবাদকে অন্তত সৃষ্টিসম হিসেবে দেখতে হবে।

বাংলা ভাষায় লেখা কোন একটি টেক্সট বাংলাভাষীমানুষ যেভাবে পড়ে অর্থাৎ গদ্য বা পদ্যের কাছে যে দ্রুতিসৌষ্ঠব সে প্রত্যাশা করে এবং যেটি থাকার জন্য একটি পাঠ সুখপাঠ্য হয়ে ওঠে অনুবাদেও অনুবাদককে সেই দ্রুতিসৌষ্ঠব নির্মাণ করতে হয়। সৃষ্টির যাতনা থেকে প্রকল্পিত অনুবাদকর্মে সেই দ্রুতিসৌষ্ঠব আবশ্যিকভাবে স্বয়ম্ভূ হয়। শক্তির অনুবাদ এই আবশ্যিকভাবে স্বয়ম্ভূ দ্রুতিসৌষ্ঠবের দৃষ্টান্ত।

একজন যিনি স্বভাষী স্রষ্টা তিনি যখন অনুবাদ করেন তখন তা কারণ সাপেক্ষ। কারণ সাপেক্ষ বলেই ব্যাক্তি স্রষ্টার কাছে অনুবাদ দ্বিতীয় শ্রেণীর। তিনি সদর্থক স্বার্থপর তাই তিনি প্রথমে নিজেকে নিজের ভাবভাষায় প্রকাশ করেন যেখানে সব কিছু তাঁর তিনি যেখানে সোহম। অনুবাদ সেখানে অবসরে, অন্য যাতনায় বা অন্য তাড়নায় বা অন্য ক্ষুধায় সৃষ্ট। তবে তিনি তাঁর পাঠককে বিস্তৃত হতে শেখান, আত্মের মধ্যে ধারণ করেন বাহিরকে। স্বভাষী স্রষ্টার অনুবাদ তাই ঘরানা ও বাহিরানার যুগল। ভাষিক ও সাংস্কৃতিক ভূগোলের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার শিক্ষা, শঙ্খ ঘোষের ভাষায় ‘ঐতিহ্যের বিস্তার’ ঘটানোর শিক্ষা দেন তিনি। ‘কবি’ তখন একটি বিশ্বময় জাত হয়ে ওঠে। কবি যেমন নিজেকে চেনান পাঠকের সামনে ঠিক তেমনি তাঁর মতো অন্য ভাষা সংস্কৃতির কবিদেরও তিনি চিনিয়ে দেন। সমগ্রশক্তি চট্টোপাধ্যায়কে পড়তে গিয়ে দেখি যখন তিনি বাংলায় কবিতা লেখেন, ভারতীয় কবিতা লেখেন, বিশ্বের নানা সংস্কৃতির কবির কবিতা লেখেনতখন তিনি নিজের মধ্যে লালন করেন দেশ ও বিদেশকে। বাংলার পাঠকের সামনে তুলে ধরেন একই সাথে ভারতীয় সাহিত্য, বিশ্ব সাহিত্য বা তুলনামূলক সাহিত্য পড়ার প্রয়োজনীয়তা।

কবির জীবন চর্যার মধ্যে যেমন এক কবি নিজেই লুকিয়ে থাকেন তেমনই অনুবাদককে খুজে পাওয়া যাবে তাঁর জীবনীতে। কোন অনুবাদকের করা অনুবাদ নিবিড়ভাবে চর্চা করতে গেলে অনুবাদের সাথে সাথে অনুবাদকের জীবন ভাবনা ও অভ্যাসের অণু পরমাণু অধ্যয়ন আবশ্যক। আর এখানেই অনুবাদ চর্চা হয়ে ওঠে একটি গভীর ও জটিল আবর্ত। অনুবাদ চর্চা এভাবেই হয়ে ওঠে আন্তর্বিভাগীয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এই সত্যের অভিজ্ঞতা আমাদের আরও একবার হয়। অনুবাদ যে কতটা অনুবাদকের জীবনী নির্ভর তা আমরা বুঝতে পারবো। অনুবাদ চর্চার মজা হল এই যে প্রথম থেকেই একটি রহস্যের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে এগোতে হয়, কেন একটি বিশেষ সাহিত্য পাঠ একটি বিশেষ ভাষাতে অনূদিত হল, কে অনুবাদ করলেন, কোন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি করলেন, কীভাবে করলেন, অনুবাদকে বিশেষভাবে ব্যাবহার করা হল কিনা, মূল সাহিত্যিক যে লক্ষ্য বা আদর্শ নিয়ে সাহিত্য পাঠটি রচনা করলেন অনুবাদক কি তা থেকে ভিন্নতর কিছু করলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

‘অগ্রন্থিত পদ্য’ গদ্যের ভেতরের মলাটে লিখিত আছে, “ষাটের দশকে শক্তি যখন তাঁর কাব্য ফসলগুলি ঘরে তুলছেন, সেই সময় তিনিহাত দিয়েছিলেন অনুবাদের কাজে। এই অনুবাদ স্পৃহা শক্তির জীবন যাপনে থেকে গিয়েছিল। ... কখনও ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্য, কখনও বিদেশী কবিদের কবিতা, কখনও বা আঞ্চলিক ভাষায় লেখা ভারতীয় কবিতার অনুবাদে শক্তি নিজেকে মগ্ন রেখেছেন। ... বিভিন্ন সময়ে অনূদিত সেই সব বিচ্ছিন্ন কবিতা সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। এই অনুবাদ মালায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতর পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে।” শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ইতিহাসের পর্যায় ক্রমের সাথে তাঁর কৃত অনুবাদের উৎস ও বিকাশের ইতিহাস নিবিড়ভাবে যুক্ত। উপরে উদ্ধৃত পংতিগুলির শেষ পংতি লক্ষ্য করলে দেখবো তাঁর অনুবাদ চর্চার ইতিহাসের মধ্যে যে শক্তি লুকিয়ে আছেন তিনি মানুষ শক্তি, কবি শক্তি বা অনুবাদক শক্তি কেবল নন, আরও বিস্তৃত কোন ব্যাক্তিসত্তা যিনি এ তিনের সমাহার এবং এই সমাহৃত সত্তা আরও জটিল ও গভীর, এবং সেটাই আমাদের আপাত চেনা শক্তির অন্য এক পরিচয়।

“অনুবাদ প্রসঙ্গঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায়”, মুকুল গুহর লেখা এই প্রবন্ধ থেকে অনুবাদ ও শক্তির সম্পর্কের গার্হস্থ্য উন্মোচিত হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য পড়ার সময় থেকেই অনুবাদ সাহিত্যের প্রতি একটি আকর্ষন তাঁর তৈরি হয়, পরে তা আরও বিকশিত হয় আবু সঈদ আয়ুবের উৎসাহে। আয়ুব, মুকুল গুহ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে একবার তাঁর বাড়িতে যা বলেন, মুকুল গুহর ভাষায় তা হল,“বাংলা ভাষায় অনুবাদের ধারাটা ক্ষীণ হয়ে আসছে। আয়ুব সাহেবের পরামর্শ ছিল বেশ কিছু অনুবাদের কথা ভাবতে। যেমন, মির, মোমেন, ওমর খৈয়াম, জিব্রান, আফ্রিকার কবিতা, জাপানের কবিতা ইত্যাদি। আয়ুব সাহেবের কথাগুলো শক্তির মনে ধরেছিল। আমাকে বলেছিল বিষয়টি নিয়ে কীভাবে কাজ করা যায় তার একটি ছক তৈরি করতে। ১৯৭৬ সাল নাগাদ আমরা যৌথভাবে এই কাজ শুরু করি।” মুকুল গুহ আরও জানান ১৯৬২ সালে আলেন গিনসবার্গ এবং তাঁর বন্ধু পিটার অরলভোস্কি কলকাতায় আসেন, তাঁদের সাথে শক্তির আড্ডা হয় কফি হাউসে এবং তাদেরই প্রভাবে কিছুটা হাংরি জেনারেশনের সূচনা। শক্তি যুক্ত হন এই আন্দোলনে, গিনসবার্গের ‘হাউল’ কাব্যগ্রন্থটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং শ্রী গুহর অনুমান সেখান থেকে শক্তির অনুবাদ স্পৃহা একটু বেড়ে যায়।

অন্যদিকে ভারতীয় ভাষার সাহিত্যিকদের সাথে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ‘ভারতভবন’ এর প্রতিষ্ঠা ও উদ্বোধন পর্বে সেখানে তাঁর কৈফি আজমি, নামদেও ধাসল, বিজয় তেন্দুলকর, হাবিব তনবীর, গিরীশ কারনাড প্রমুখ সাহিত্যিকদের সাথে পরিচয় ও সম্পর্কের গভীরতা তৈরি হয়। তিনি হিন্দির ছায়াবাদী আন্দোলন, ওড়িশার সবুজ আন্দোলনের মতো ভারতীয় কবিতার আন্দোলনগুলি বিষয়ে বেশ সচেতন ছিলেন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মাথায় এক সময় চেপে বসেছিল শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশের চিন্তা, কহলিল জিব্রান, নিগ্রো কবিতা, আমেরিকান ইন্ডিয়ান কবিতা, মায়াকোভস্কির কবিতা একের পর এক অনুবাদ করতে থাকেন। তিনি কোন একজন কবিকে ধরে তাঁর সব কবিতা অনুবাদ করতে চাননি, তাই তাঁর অনুবাদগুলো বড় ক্যানভাসে ছড়ানো ছেটানো ছবির মতো। সংস্কৃত থেকে তিনি অনুবাদ করেছেন ‘মেঘদূত’, ‘কুমারসম্ভব’, ‘ভাগবদগীতা’, ‘সামসংগীত’, ভারতীয় ভাষা থেকে, রামাকৃষনন, ভারিইয়ার, শ্রীধর মেনন, হোনডল, আমৃতা প্রীতম, অমরজীৎ চন্দন, শহাব জাফরি, গীতাঞ্জলী বদরুদ্দিন ও গালিব এবং বিদেশী সাহিত্য থেকে নেরুদা, ব্লেক, হাইনে, বোদলেয়ার, মায়াকোভস্কি, ফ্রস্ট, ওয়াড, উইলারড, জিব্রান, লোরকা, হাইনে, ওমর খৈয়াম। কবি নিজে বেছে দিচ্ছেন কি শ্রেষ্ঠ, তাঁর কাছে যা শ্রেষ্ঠ তা তিনি অনুবাদ করছেন, কিন্তু তা হলেও তো পাঠক প্রাথমিকভাবে অন্য সাহিত্যে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে, একটা বিশ্বাসের হাত ধরে।

‘অগ্রন্থিত পদ্যে’র প্রচ্ছদ থেকে জানা যায়, “সবসময়ে সবচেয়ে আলোড়ন তুলেছিল শক্তি কৃত ভগবদ গীতার কয়েকটি অধ্যায়ের অনুবাদ। এক প্রবল ইচ্ছা তাঁকে এই অনুবাদের কাজে টেনে এনেছিল। যদিও বলতেন, ‘কঠিন, খুবই কঠিন কাজ’, তবুও গীতার পদ্যানুবাদে তিনি আগ্রহ হারাননি। গীতা সম্পর্কে তাঁর নিজের দর্শনটি ছিল এই রকমঃ ‘ধর্ম টর্ম নয়, গীতার কবিত্ব আমাকে খুব টানে। সংস্কৃত মন্ত্রগুলো উচ্চারন করতে যত ভালোলাগে তার ভেতরের অন্তর্নিহিত সত্যে পৌঁছতে তত আগ্রহ লাগেনা, বাইরের শক্ত খোলাটার জন্য। তাই গীতার সহজ অনুবাদে হাত দিয়েছি আমি।” সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ মধ্যযুগ থেকে যে কারণগুলোর জন্য হয়ে আসছে তার মধ্যে এই দুর্বোধ্যতা ও প্রবেশের মুষ্টিমেয়তা একটি বড় কারণ। রামমোহন রায় যখন বেদ, উপনিষদ অনুবাদ করছেন তখনও একটি উদ্দেশ্য ছিল এই জ্ঞান সমগ্র সবার জন্য খুলে দেওয়া। শক্তির সংস্কৃত সাহিত্য অনুবাদের আরেকটি কারণ ছিল সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর প্রেম আর সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দকে বাংলার সহজ ছন্দে রূপান্তরিত করার বাজি।

অনুবাদ নিশ্চিতভাবেই একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিবেশ দাবি করে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে আমরা দেখি তিনি যে সংস্কৃতির মধ্যে বিচরন করেছেন যে ব্যাক্তি চরিত্রগুলোর সাথে পরিচিত হয়েছেন ও জ্ঞান লাভ করেছেন সেই অভিজ্ঞতা একজন সংবেদনশীল ব্যাক্তি হিসেবে শক্তির কাছে নিশ্চয় কিছু দাবি করে, যে দাবি তিনি পূরণ করেছেন নিশ্চিতভাবেই অনুবাদের মধ্য দিয়েও। বাংলা ভাষা সাহিত্যের ও বাংলার জীবনের যে সামগ্রিক সাংস্কৃতিক সম্পদ তাতে সাংস্কৃতিক ভাবে বাংলা অনেকের সাথে সম্পর্কিত তাই বাংলায় অনুবাদের চর্চার ব্যাপ্তি থাকা স্বাভাবিক। এবং এই যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এই সম্পর্ক অনুবাদ কর্ম সংঘটিত হওয়ার জন্য একটি বড় কারণ। অনুবাদ সাহিত্য তৈরি হওয়ার সাথে অবশ্যই একটি বিশেষ ভাষা সংস্কৃতির পাঠক সমাজের সচেতনতা বা জ্ঞান স্পৃহা ও নিজেকে বৃহতের সাথে দেখার প্রবণতা থাকা দরকার। এই সাংস্কৃতিক মনাদ গুলো থাকার সুযোগ থাকেনা বলেই অপেক্ষাকৃত প্রান্তিক ভাষায় অনুবাদের এই ঐতিহ্য তৈরি হয়না। অন্যদিকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো অপার্থিব প্রতিভার মানুষরা যখন অনুবাদের কাজে হাত দেন, তখন তিনি যতটাই অনুবাদ করুন না কেন বা যাইই অনুবাদ করুননা কেন, অনুবাদ সংস্কৃতি তাতে লাভবান হয়। নিজ ভাষার প্রতিষ্ঠিত কবি বলে সেই বিশ্বাসযোগ্যতার জায়গা থেকে পাঠক তাঁর কৃত অনুবাদে স্বচ্ছন্দে হাত দিতে পারে। শুধু মাত্র অনুবাদক যিনি তার অনুবাদ পাঠকের বাজারে লাইসেন্স পেতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। শক্তি, সুনীলরা সেক্ষেত্রে এক একজন লাইসেন্স বা সংস্কৃতির চেকপোস্ট যেখান দিয়ে অনুবাদ খুব সহজেই প্রবেশ করতে পারে। দীপেশ চক্রবর্তী ‘ইতিহাসের জনজীবনে’র কথা বলেছিলেন, তেমনি যতদিন না অনুবাদের জনজীবন তৈরি হবে ততদিন আমরা বৃহত্তর জ্ঞান থেকে দূরে থাকবে, একটা সামগ্রিক সাংস্কৃতিক অসচেতনতা আমাদের ঘিরে রাখবে। নিজ ভাষার প্রতিষ্ঠিত কবি সাহিত্যিকদের হাতের অনুবাদ খুব সহজে একটি সংস্কৃতিতে এই জনজীবন নির্মাণ করতে পারে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় সেদিক থেকে সংস্কৃতির খুব বড় উপকার করে গেলেন।

# রূপকথার ছদ্মবেশ ও বিশ্বসাহিত্য

# ড. ঋতম্‌ মুখোপাধ্যায়

# অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

# চন্দন নগর সরকারি মহাবিদ্যালয়

জার্মান কবি গ্যোয়েটে বলেছেন : ‘এই রূপকথা একই সঙ্গে অর্থময় ও অর্থহীন’। কিন্তু তা কি নিছক শিশুপাঠ্য? না। বাস্তবের রূঢ়তা থেকে কল্পলোকের পথে পাড়ি দেওয়াই রূপকথার লক্ষ্য। রূপকথা আসলে অপূর্বকথা বা অপরূপকথা; অবান্তর,অপ্রধান ও ছোট আখ্যায়িকা – বলেছিলেন ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন। জনৈক ইংরেজ সমালোচক রূপকথায় দেখেন ‘aspiration to a higher life, freer and purer life’ আর অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘রূপকথা’ শীর্ষক ছোট অথচ ভাবনাজাগর প্রবন্ধে জানিয়েছেন :

‘প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে রূপকথা অবাস্তব নহে, উহা একটা বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।...রূপকথা কতগুলি অসম্ভব বাহ্যঘটনার ছদ্মবেশ পরিয়া আমাদের মনের সহিত ইহার প্রকৃত ঐক্যের কথা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ছদ্মবেশ খুলিলেই ইহার সহিত আমাদের যোগসূত্র সুস্পষ্ট হইবে।’ ( রূপকথা / বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা )

এই সমাজের,সময়ের ক্ষতমুখ রূপকথায় উৎকীর্ণ রয়েছে বলেই এগুলি ‘ছদ্মবেশী সত্যকথা’। দেশে-বিদেশে সর্বত্রই এই রূপকথা বা ফেয়ারি টেল-এ নারীসমাজের যন্ত্রণার ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। স্নো হোয়াইট, সিণ্ডারেলা,হ্যানসেল-গ্রেটেল, দ্য ফ্রগ প্রিন্স, বুদ্ধু-ভুতুম, নীলকমল-লালকমল, সুখু-দুখু, সাতভাই চম্পা ইত্যাদি সমস্ত গল্পেই দেখা যায় সুয়োরাণী সুখী, দুয়োরাণী বঞ্চিতা। কিংবা স্বামীর আগের পক্ষের ছেলেমেয়ের প্রতি সৎ মায়ের নিষ্ঠুরতার ছবি দেখানো হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে সেই সন্তানেরা রাজকন্যাকে জয় করে ও মায়ের দুঃখ ঘোচায়। আসলে অপ্রাপণীয় যে জীবন ও অচরিতার্থ যে স্বপ্ন তাকেই কাহিনিরূপ দেওয়া হয়েছে এসব গল্পে, অলৌকিকতার আগমনও সেই কারণেই। তাই লোকসাহিত্যের গণ্ডিতে রূপকথাকে বেঁধে রাখা হলেও আধুনিক সাহিত্যের আঙ্গিনায় সে ব্রাত্য নয়। উত্তরকালের বাংলা সাহিত্যেও পড়ছে রূপকথার ছায়া। বিশিষ্ট অবয়ববাদী আখ্যানতাত্ত্বিক ভ্লাদিমির প্রপ রাশিয়ার একশোটির বেশি লোককথা ঘেঁটে তাদের কথনবিন্যাসে পুনরাবৃত্তির একটা সাধারণ ছক খুঁজে পান। প্রায় একত্রিশটি ‘নির্বাহণ’(Functions) তথা কার্য ও প্রতিক্রিয়ার সূত্রে প্রপ দেখান কিভাবে নায়ক কঠিন কাজের প্রস্তাব পান ও খলনায়ককে পরাজিত করে রাজকন্যাকে জয় করেন। এই প্রেক্ষিতে তরুণ মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্ন ‘কতটুকু রূপকথা?’ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এমনকি আমরা যে মিথ-পুরাণের কথা বলেছিলাম, সেখানেও তো এমনই রূপক। হাতের কাছেই রয়েছে ‘রামায়ণ’। রবীন্দ্রনাথ যে-রামায়ণে কৃষিজীবী আর যন্ত্রসভ্যতার দ্বন্দ্ব খুঁজে পেয়েছেন। সাম্প্রতিক কালের বাংলা কবিতা কিংবা উপন্যাসে রূপকথার নানাবিধ পুনর্নির্মাণ ঘটে দেখি। বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে একালের শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের কবিতাতেও এসেছে রূপকথার চরিত্র : কঙ্কাবতী, নীলকমল-লালকমল, রাক্ষস-রাক্ষসী, রাজা-রাণী-রাজকুমার-রাজকন্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গ। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের আধুনিক গল্প-উপন্যাসেও এসেছে রূপকথাধর্মিতা। তাছাড়া জাদু-বাস্তবতা, অধিবাস্তবতার ভিতরেও কি নেই রূপকথার ক্ষীণ ছায়া?

**২. স্বপ্নের ভিতরে এক আজব দেশে পাড়ি দিয়েছিল ছোট্ট অ্যালিস। তার সেই অ্যাডভেঞ্চারের ভিতরে কতসব আজগুবি ঘটনা। পশু-পাখিদের কথা বলা, ছোট-বড় হওয়ার ওষুধ কিংবা হাম্পটি-ডাম্পটি, তাসের রাজ্য, কথাবলা বিড়াল ইত্যাদি আজগুবি ঘটনার কথা আমাদের শুনিয়েছিলেন লুইস ক্যারল (১৮৩২-১৮৯৮)। সাল ১৮৬৫। প্রতিবেশী বাচ্চাদের গল্প শোনাতে ভালোবাসতেন লুইস, তেমনই জনৈকা বাচ্চা মেয়ে অ্যালিস লিডেল-কে মুখে মুখে যেসব গল্প বলতেন তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে তারই জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন। এভাবেই জন্ম নিয়েছিল ‘অ্যালিসেস্‌ অ্যাডভেঞ্চারস্‌ ইন ওয়ান্ডারল্যাণ্ড’, যা বিবাহিত অ্যালিস কোনো একসময়ে বিক্রি করে দিয়েছিলেন এক গ্রন্থ-সংগ্রাহককে। এক আজব দেশ আর উদ্ভট রসের মিশেল অব্যাহত ছিলো তাঁর ‘আয়নার ওপারে অ্যালিস’ তথা ‘থ্রু দ্য লুকিং গ্রাস’ – এর কাহিনিতেও। এই অদ্ভুত জগতের বঙ্গীয় তুলনাক্ষেত্র ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘কঙ্কাবতী’ বা লুল্লু-কাহিনি। আর বাংলা সাহিত্যে অ্যালিসের প্রত্যক্ষ ছায়া পড়েছে সুকুমার রায়ের ‘হ য ব র ল’(১৯২৪)-এ, সেকথা আগেই বলেছি। কিন্তু এসবের বহু আগেই তো দেশ-বিদেশের রূপকথার ভিতরে এমন অদ্ভুত রসের সন্ধান পেতাম আমরা। গ্রিম ভাইদের সেইসব আশ্চর্য রূপকথা কিংবা স্নো-হোয়াইট, সিণ্ডারেলা, বিউটি অ্যাণ্ড দ্য বিস্ট ইত্যাদি বিদেশি রূপকথা, অসংখ্য রুশ রূপকথা এবং আমাদের আদি অকৃত্রিম ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ ও ‘টুনটুনির বই’ শিশু মনকে আবিষ্ট করে দিতো। বড়দের মনেও এসব গল্পের কথা কোনোদিন পুরনো হওয়ার নয়। আরও পিছনে হাঁটলে দেশ-বিদেশে মিথ-পুরাণের ভিতরেও কি নেই এমন অভাবনীয় আশ্চর্য কাহিনি?**

**ইদানীং শ্রীমতী জে.কে. রাওলিং-এর হ্যারি পটার সিরিজ়ের সাতটি খণ্ড যখন বিজ্ঞাপনে আর প্রচারের মাধ্যমে বিশ্ববই-এর বাজার দখল করে ফেলেছিল। ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ – দশছর ধরে আশ্চর্য জাদু দুনিয়ার যেসব গল্প শুনিয়েছিলেন রাওলিং সাতটি খণ্ড জুড়ে, সেখানে বুনে দিয়েছিলেন জাদু, অ্যাডভেঞ্চার আর শুভ-অশুভের জটিল আখ্যান। ই-বুক হিসেবে প্রতিটি খণ্ডে চোখ বোলালেও, মূলত সিনেমার মধ্য দিয়েই হ্যারি-রন-হারমিওনের জাদু-জগতের সঙ্গে আমার পরিচয়। তাও বিজ্ঞাপনী মোহে নয়, আমার মাসতুতো ভাই সোমক আর ভ্রাতৃপ্রতিম আশিসগোপালের উৎসাহে। পটার-সিরিজ়ের শেষ ছবির অভিঘাতে অণুকবিতাও লিখেছিলাম : ‘**মৃত্যুর উদ্ভাস পার হওয়া আলো / পটারের শেষ ছবি, মিলনান্ত সুখ...’। তবে পটার-পাগল হইনি কখনও। ছোটবেলা থেকেই বাবার মুখে রূপকথা আর ভূতের গল্প শুনতে দারুণ ভালোবাসতাম। আরেকটু বড়ো হয়ে পড়েছি রূপকথা,উপকথা, লোককথা যেখানে যা-পেয়েছি, স-অ-ব। কণ্ঠস্থ ছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সহশিল্পীদের করা এইচ-এম.ভির ক্যাসেট ‘ঠাকুরমার ঝুলি’। অ্যানিমেশনের কল্যাণে ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ কিংবা ‘টুনটুনির বই’-এর দৃশ্য-শ্রাব্য মনোহারিত্ব ও জনসংযোগের ক্ষমতা স্বীকার করেও, বলতে হয় আমার শৈশবের কল্পচিত্রের সৌন্দর্য সেখানে অনুপস্থিত। তবে ভাল লাগে রাজা ও টুনটুনি-র গল্প-কে নিয়ে ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের ‘ফুড়ুৎ’ নাটকের চমৎকার উপস্থাপনা।

৩. জন্মসার্ধশতবর্ষের সীমায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫)। ‘টুনটুনির বই’, ‘গুপি গাইন বাঘা বাইন’, ‘মহাভারতের কথা’ ‘পুরাণের গল্প’-র অমর স্রষ্টার কাহিনিগুলিও কিন্তু গ্রামজীবনের মৌখিক সাহিত্য ও হিন্দু-পুরাণ-মহাকাব্য থেকেই বাংলা ছাপার অক্ষরে তুলে আনা। রাজা-জোলা-টুনটুনি-বাঘ-শিয়াল-বিড়ালের এইসব গল্পে প্রচ্ছন্ন নীতিকথা থাকলেও কৌতুকের পরিমাণ বেশি। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ বা ঈশপের ‘ফেবলস্‌’-র মতো এখানে পশু-পাখিরা কথা বলে। আজগুবি বা অবিশ্বাস্য ঘটনার বর্ণনা রয়েছে ‘পিঁপড়ে আর হাতি আর বামুনের চাকর’ গল্পে। মজন্তালি সরকারের সবজান্তা লোক-দেখানো হামবড়া স্বভাবের মধ্যে চেনা মানব সমাজেরই ছায়া। সাদা-কালো ছবিগুলিও লেখকের আঁকা। পৌত্র সত্যজিৎ রায় তাই বলেন :

এক রঙা ছবিতে ছোটোরা কল্পনা করে, কোন্‌টা কী রঙ হবে। এতে তাদের কল্পনাশক্তির বিকাশ হয়। ... এই জন্যে টুনটুনির বইয়ের সব ছবি একরঙা। তবে আদর্শ ঐ ঠাকুরমার ঝুলি। লেখক শুধু মাত্র টাইপ ছোটো বড়ো করে লেখা গল্পতে বলার ভঙ্গি এনেছেন। আর কী সুন্দর সব উডকাট ছবি। প্রতিটি ছবি গল্পের সঙ্গে মানানসই।

পাশাপাশি জন্মের ১২৫ বছর পার হতে চলেছে উপেন্দ্রকিশোর পুত্র সুকুমার রায়েরও (১৮৮৭-১৯২৩)। তাঁর ‘আবোলবতাবোল’, ‘খাই খাই’ ইত্যাদি ‘ননসেন্স’ ছড়ার পাশাপাশি আমরা ‘হ য ব র ল’-এর কথা এ-প্রসঙ্গে ভাবতে পারা যায়। পড়তে বসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে জগতে প্রবেশ করা যায় এবং যেখানে আপাত আজগুবি ঘটনার ভিতরে সুকুমার সুকৌশলে মিশিয়ে দেন সমাজ-সমালোচনা। উদ্ভট রসের সার্থকতা সেখানেই। সুকুমার সমগ্রের ভূমিকা লিখতে গিয়ে সত্যজিৎ জানাচ্ছেন :

বাংলা গদ্যে ননসেন্সের এই শ্রেষ্ঠ নিদর্শনটি নিঃসন্দেহে লুইস ক্যারলের অ্যালিস দ্বারা অনুপ্রাণিত। এখানেও সেই ঘাসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া, সেই স্বপ্ন, সেইসব চেনা-আধচেনা জানোয়ার ও মানুষ চরিত্রের মিছিল, ভাষা নিয়ে, সামাজিক আচার নিয়ে আইন-কানুন নিয়ে তির্যক রসিকতা, আর অবশেষে ঘুম ভেঙে স্বপ্নের জগৎ থেকে সেই বাস্তবে ফিরে আসা। তফাত এই যে, **হ য ব র ল** মেজাজে একেবারে ষোল আনা বাঙালি, এতই বাঙালি যে অন্য কোনো ভাষায় এর অনুবাদ কল্পনাই করা যায় না।

রুমালের বেড়াল হয়ে যাওয়া, তিব্বত যাওয়ার শর্টকাট পথ বাতলানো,চশমা বানান করতে গিয়ে বলা ‘চন্দ্রবিন্দুর চ বেড়ালের রুমালের মা – হল চশমা। কেমন, হল ত?’ কিংবা বিচারসভার নামে আইনের অবান্তর জটিল ভাষা, পয়সা দিয়ে সাক্ষী ও আসামী কেনা এবং বিচারকের ঘুমানো, আজগুবি ছড়াকাটা ইত্যাদি হাসি ও বিদ্রূপ-কে যুগপৎ একবৃন্তে ফুটিয়ে তুলেছেন সুকুমার। তবে একথাও ঠিক রূপকথার অলৌকিকতার মধ্যে স্বাভাবিকতা আছে, কোনো কিছুই সেখানে অপ্রত্যাশিত নয়। সেখানে হ য ব র ল বা অ্যালিস-কাহিনি ফ্যান্টাসির জগতে নিয়ে যায় পাঠককে। রূপকের মোড়কে যতই বাস্তব-পৃথিবীর অসঙ্গতিকে তুলে ধরা হয় ততই আমাদের হাসি বাঁধ মানে না। গবেষক-অধ্যাপক ড. কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী এ-প্রসঙ্গে তুলনামূলক সূত্রে এ রবীন্দ্রনাথের ‘সে’(১৯৩৭) গেছোবাবা-র গল্প-অধ্যায়টিকে টেনে এনেও ‘হ য ব র ল’(১৯২৪)-এর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নেন। কৃষ্ণরূপ দেখেন : ‘কাহিনির শুরুতেই গরমের দুপুরে নিদ্রার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব পৃথিবীর গ্রাউন্ড রুল ভেঙে যায়। ফলে অসঙ্গতিজাত কান্ডকারখানার ও অপ্রত্যাশিতের আগমন সম্পর্কিত এক ধরনে প্রস্তুতি তার ভেতরে তৈরি হয়েই থাকে’ (১৯৮৩ : ৬৩-৮৮) । ফ্যানটাসি, অ্যাবসার্ড ও রূপকের চরিত্র মিলেমিশে এই মিশ্রসংরূপের অনন্য উদাহরণ ‘হ য ব র ল’ কিংবা ‘হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী’ ‘অপরিচিত জগতের অসঙ্গতি ও তা থেকে জাত কৌতুকপূর্ণ বিস্ময়বোধ’-এর আবেশ তৈরি করে পাঠকমনে।

**৪.** আজ থেকে একশো পাঁচ বছর আগে প্রকাশিত ‘ঠাকুরমার ঝুলি’(১৯০৭)-র ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই প্রবেশক মনে রাখার মতো :

‘ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিষ আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেষ্টার কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল। এখনকার কালে বিলাতের ‘Fairy Tales’ আমাদের ছেলেদের একমাত্র গতি হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে’। তাঁহাদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোনো কোনো স্থলে মার্টিনোর এথিক্‌স্‌ এবং বার্কের ফরাসী বিপ্লবের নোটবই বাহির হইতে পারে, কিন্তু কোথায় গেল – রাজপুত্র পাত্তরের পুত্র, কোথায় বেঙ্গমা বেঙ্গমী, কোথায় – সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের সাত রাজার ধন মানিক!’

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের (১৮৭৭-১৯৫৭) আগে এই চেষ্টা কেউ কেউ করেছিলেন। যেমন, লালবিহারী দে, উইলিয়ম কেরী, দীনেশচন্দ্র সেন এঁরা গ্রাম্য মৌখিক সাহিত্য উদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছিন। কিন্তু হুবহু মুখের ভাষাকে ফোনোগ্রাফ দিয়ে রেকর্ড করে তাকে যথাসম্ভব মৌখিক রীতিতে বাঙালি-পাঠকের কাছে উপস্থিত করার কৃতিত্ব একমাত্র দক্ষিণারঞ্জনের। পাশাপাশি প্রারম্ভিক অক্ষরটিকে আকারে বড়ো রেখে চিত্ররূপময় করে তোলা, প্রাসঙ্গিক ছবি এঁকে গল্পটিকে দৃশ্যময় করে তোলা এবং মাঝেই ছোট বড়ো অক্ষরের সমাবেশ, বাক্যের পুনরাবৃত্তি ‘ঠাকুরমার ঝুলি’-র বিচিত্র স্বাদের গল্পগুলিকে নিজস্বতা দিয়েছে। যথার্থ গবেষকের মতোই দক্ষিণারঞ্জন গল্পগুলিকে সাজিয়েছেন চারটি উপবিভাগে : দুধের সাগর (দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প), রূপ তরাসী (রাক্ষস-রাক্ষসী-খোক্কসের গল্প), চ্যাং ব্যাং (মানবেতর প্রাণীদের কাহিনি ও মজার গল্প) এবং আম সন্দেশ (ঘুম পাড়ানি গ্রাম্য ছড়া)। গল্প-ছবি আর ছড়ায় মোড়া এই কাহিনিগুলি রবীন্দ্রনাথের মতে ‘মাতৃদুগ্ধ’, যা ‘সমস্ত বাংলাদেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি’কে শিশুমনে প্রবেশ করিয়ে দেয়। এ-জাতীয় আরো তিনটি সংকলন [ঠাকুরদার ঝুলি, ঠানদিদির থলে, দাদামশায়ের থলে] তিনি প্রকাশ করলেও রূপকথা-সংকলন ‘ঠাকুরমার ঝুলি’-ই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। মিত্র-ঘোষ প্রকাশিত সংস্করণটির বিক্রি এখনও কমেনি।

৫. একালে ইংরেজি মিডিয়মে পড়া শিশু-কিশোরেরা রাউলিং, ব্লাইটন কিংবা ট্রোলকিনের থ্রিলার যেভাবে উন্মাদনার সঙ্গে পড়ে, সেভাবে বাংলা রূপকথা শোনে না, পড়ে না, দেখেও তেমন আনন্দ পায় না। ২০০৭ সালে লেখা একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে লোপামুদ্রা মৈত্র দেখান, সিডি বা ডিভিডি মাধ্যমে ডিজিটালাইজড্‌ ‘ঠাকুমার ঝুলি’ কিন্তু জনপ্রিয় হয়েছে, দৃশ্য-শ্রাব্যময়তা এর কল্পনা ও অবিশ্বাস্য-ভাবনার জগৎকে খর্ব করলেও নিহিত বার্তা অক্ষুণ্নই থাকে। তবে প্রযুক্তির উন্নত ব্যবহারের কারণে পটার-দুনিয়া যেভাবে ‘মাগল্‌’দের বিস্মিত করে রাখে, ঠাকুরমার ঝুলির ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা অনেক সীমিত। একাধারে মনোরঞ্জনের পাশাপাশি সমাজচিত্র, শিক্ষাদান এবং প্রতিবাদের ছবিও রয়েছে এই কাহিনিগুলিতে। ‘এক যে রাজা, রাজার সাত রাণী’ – দিয়ে যে সব গল্পের শুরু সেখানে কথক অবশ্যই বয়োজ্যেষ্ঠা ঠাকুমা, তিনি একজন নারী এবং পাশাপাশি সতীন সমস্যার ছবিও ফুটে ওঠে। নানাভাবে বঞ্চিতা রাণীরা আবার স্বস্থানে ফিরে আসে দুঃখভোগের শেষে। উদারহৃদয় একদা দুঃখী রাজকুমারেরা কিন্তু সুখের দিনে তাদের সৎ মা বা ভাইদের অবহেলা করে না (কলাবতী রাজকন্যা, শীত বসন্ত, সুখু দুখু)। বীরাঙ্গনা নারী কিরণমালা কিংবা প্রতিশ্রুতিভাঙা সূঁচ রাজকুমারের রাণী কাঞ্চনমালার রাজ্য শাসন-এর ছবিগুলির ভিতরে নারীর গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। শেয়ালের গল্পে পাই অতিচালাকের উচিত সাজার চিত্র। আজকের নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির সমাজে রূপকথা একান্নবর্তিতার মন্ত্র দেয়। একটা ঐতিহ্যসচেতনতা আগাগোড়াই ঠাকুরমার ঝুলির ভিতর ছড়িয়ে রয়েছে। আধুনিক সমাজে যে-ঐতিহ্যকে বিশ্বায়নের মোহে ছুটে চলা বাঙালির বেশি করে প্রয়োজন। আসলে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে দক্ষিণারঞ্জন যে রূপকথা সংগ্রহের কাজ শুরু করেন তা দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়। একুশ শতকে যখন ফিরে পড়ি সেই কাহিনি চিরনূতন মনে হয়। যদিও তার জন্য বাংলা ভাষাটা জানা দরকার।

৬. কিশোর উইজার্ড হ্যারি ও তার সংগ্রাম : বিশ্বের বহুভাষায় অনূদিত হয়েছে সেই কাহিনি। শেষ কয়েকটি খণ্ডের ক্ষেত্রে এমন হয়ে দাঁড়িয়ছিল যে, মধ্যরাত্রি থেকে পাঠকেরা লাইন দিতেন প্রতিটি দেশের বুক স্টলগুলিতে। এই পটার-ফিভার ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ছাড়িয়ে কলকাতাতেও আছড়ে পড়েছিল গত দশকেই। আর সেলুলয়েডের সহায়তায় সেই উন্মাদনা চূড়ান্ত আকার ধারণ করতে থাকে। কিন্তু শুধুই কি প্রচার আর চমক? সারবস্তু, অভিনবত্ব কিছুই কি নেই হ্যারি পটার-এর সাত খণ্ডব্যাপী জাদু-কাহিনি জুড়ে? নিশ্চয় আছে। না-থাকলে এই সাইবার প্রজন্ম এতো সহজে আবিষ্ট হতো না। হ্যারি, রন, হারমিওনের অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব এবং শৈশব থেকে কৈশোরে বড় হওয়ার পথে নানা বাধা, শত্রুতা এবং সর্বোপরি দুষ্টের দমন তথা অন্ধকারের প্রতিনিধি মৃত্যুদূত লর্ড ভোল্ডেমর্টকে পরাজিত করে জীবনের উপর কালো ছায়া সরিয়ে দেওয়ার বার্তা চিরকালের। পাশাপাশি রয়েছে শিক্ষাপদ্ধতির ছবি। জনৈকা শিক্ষিকার বজ্র আঁটুনি-কে পছন্দ করেননি রাউলিং। হগওয়ার্টসের আদর্শ হেডস্যার ডাম্বেলডোর কোমলে-কঠিনে গড়া মানুষ। হোক না জাদুশিক্ষার স্কুল, প্রফেসর স্নেপের মধ্য দিয়ে শিক্ষা জগতের কালো দিককেও তুলে ধরেছেন লেখিকা। সর্বকালে সর্বদেশে কি আমরা এই শিক্ষকদের পারস্পরিক ঈর্ষা এবং ম্যালফয়ের মতো খারাপ ছাত্রদের দেখতে পাই না? রয়েছে বয়ঃসন্ধির প্রেম এবং একাধিক মৃত্যুর পথ পার হয়ে অবশেষে হ্যারি তথা নায়কের রুদ্ধশ্বাস জয়।

এগারো থেকে সতেরো : হ্যারির সাতবছরের জাদু-স্কুলে শিক্ষিত হওয়ার একেকটি বছর ধরে রচিত হয়েছে হ্যারি পটার সিরিজ। নামের মধ্যেও রয়েছে নিত্যনতুন চমক, যদিও প্রতিটি বছরেই হ্যারি ও তার সঙ্গীদের কালো জাদুর বিরুদ্ধে লড়াই করার নতুন পথ খুঁজে নিতে হয়। ভোল্ডেমর্টের হাতে মৃত হ্যারির বাবা-মা আর জীবিত সন্তান হ্যারিকে মারতে চেয়েও ব্যর্থ ভোল্ডেমর্ট চেষ্টা করে চলে। হ্যারির কপালে সেই আঘাতের স্থায়ী চিহ্ন। তার মা নিজের প্রাণ দিয়ে হ্যারিকে রক্ষা করেছিল। তারপর মাসি-মেসোর বাড়িতে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য হওয়া হ্যারি একদিন নিজের স্বরূপ জানতে পারে। সে জাদুহীন ‘মাগল্‌’ নয়, সে জাদুক্ষমতা নিয়ে জন্মানো ‘উইজার্ড’। এরপর পৌনে দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে অদৃশ্য ট্রেন ধরে হ্যারির জাদু স্কুলে আসা আর ক্রমশ সুশিক্ষিত হয়ে ওঠা। কারণ, ভোল্ডেমর্টের মৃত্যু তারই হাতে। জোড়া মৃত্যু দিয়ে শুরু হওয়া এই দীর্ঘ আখ্যানের ভিতরে ক্রমাগত মৃত্যুর কালো ছায়া বিস্তৃত হয়েছে। সাতটি সিক্যুয়েলে হ্যারি হারিয়েছে বহু প্রিয়জনকে হেডস্যার ডাম্বেল্‌ডোর, সিরিয়াস ব্ল্যাক ইত্যাদি। কিন্তু তিন বন্ধুর জয়যাত্রা অব্যাহত থেকেছে। পরিশেষে যখন হ্যারি জেনেছে ভোল্ডেমর্টের প্রাণকণা টুকরো হয়ে ছড়িয়ে বিভিন্ন জায়গায় যার কয়েকটিকে হ্যারি ধ্বংস করেছে ইতিমধ্যেই ( উদা: দ্বিতীয় বইয়ে ডায়েরি)। শুধু সে নিজেই যে শেষ ‘হরক্রাক্স’ বা প্রাণকণার আধার তা জেনে হ্যারি মৃত্যুর অভিনয় করে। এবং তারপর বেঁচে উঠে ভোল্ডেমর্টের সাথে লড়াইয়ে অশুভ জাদু ব্যুমেরাং হয়ে ভোল্ডেমর্টকে ধ্বংস করে দেয়। আখ্যানের উত্তরভাগে আঁকা হয় হ্যারি-জিনি ও রন-হারমিওনের বিবাহিত জীবনে সন্তানদের আবার জাদু-স্কুলে পাঠানোর অন্তিম ছবি। মোটামুটি নিটোল এক আখ্যান।

৭. ফিলোজ়ফারস্‌ স্টোন, চেম্বার অব সিক্রেটস্‌, প্রিজ়নার অব আজ়কাবান, গবলেট অব ফায়ার, অর্ডার অব ফিনিক্স, হাফ ব্লাড প্রিন্স এবং দি ডেথলি হ্যালোজ় : এই সাত খণ্ড বইয়ের দেশি,বিদেশি সমালোচনার সিংহভাগই প্রশংসায় ভরা। এই সাইবার-প্রজন্মকে বইমুখী করার সাফল্য এবং প্লট নির্মাণের এই দক্ষতা সবার নজর কেড়েছে। তদুপরি রয়েছে ডিকেন্সীয় হাসি-কান্না-ভয় মেশানো এক চলমান ছবি আঁকার সাফল্য। নিন্দুকেরা এ-কাহিনিতে চেনা রূপকথার উপাদান ও একাধিক টিভি সিরিয়াল ও কার্টুনের অতিশায়িত রূপ দেখলেও বইটিত জনপ্রিয়তা মার খায়নি। শিশুপাঠ্য ও প্রাপ্তবয়স্কপাঠ্য দ্বিবিধ সংস্করণে প্রকাশিত হয়ে চলা এই পটার-সিরিজ়ের বইগুলির ভিতরে শিশু মনস্তত্ত্ব, সমাজ মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি সবমিলিয়ে সাহিত্যগুণের খামতি আদৌ নেই। বিদেশের কথা ছেড়ে আমরা প্রবীণ ও নবীন দুই বাঙালি সাহিত্যিকের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া তুলে ধরতে পারি :

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : বাস্তবতা ও যুক্তি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে নির্দ্বিধায় এরকম পরপর গাঁজাখুরি ঘটনা সাজিয়ে যাওয়াতেই লেখিকার কৃতিত্ব। কারওকে যদি বলা হয়, তুমি অনবরত কথা বলে যাও, কিন্তু সব মিথ্যে কথা বলতে হবে, তা হলে ক’জন পারবে। শ্রীমতী রাউলিং সেটাই পেরেছেন। ... প্রকাশনার ইতিহাসে যতই ইতিহাস সৃষ্টি করুক। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এ বই একটা হুজুগের অবসান হিসাবে পর্যবসিত হবে। একেবারে কোনও সারবস্তু না থাকলে সে বই যতই খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হোক, পাঠকদের মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না, সেই লেখক বা লেখিকা সম্পর্কেও পাঠকের শ্রদ্ধা থাকে না।

(দেশ : বইমেলা/৩.২.২০০১)

পৌলোমী সেনগুপ্ত : আসলে পটার-সাফল্য যতই খর্ব করার চেষ্টা করা হোক, ব্যাপারটা মার্কেটিংয়ের লোকেদের হাতে আদৌ বন্দি নয়। রহস্য সামাধানের জাদুকাঠি আছে যাঁর হাতে, তিনি লেখিকা জে.কে.রাওলিং নিজে। বাংলাদেশে পটার-কাহিনিকে খাটো করে ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ বা ‘আবোল তাবোল’ কে বড় করে দেখানোর একটা চেষ্টা করা হয়েই থাকে এবং রাওলিংকে আজগুবি গল্পের অক্ষম আবিষ্কর্তা হিসেবে মার্কা করে দেওয়ার প্রয়াস দেখা যায়। ‘ঠাকুরমার ঝুলি’? যাতে রাক্ষসী সৎ মা ছেলের মুণ্ডু কড়মড় করে চিবিয়ে খায় বা রাজার সুয়োরানি হাড়মড়মড়ি ব্যারামে ভোগে? তাতে বুঝি আজগুবি কিছু নেই? নাকি ‘আবোলতাবোল’-এ সেই টান আছে যা পাঠককে বই বন্ধ করতে দেয় না? এদিক-ওদিক না তাকিয়ে লাভ নেই, সোজা বলা ভাল , ‘না, নেই’। পটারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে একমাত্র যে আর ট্রোলকেন-এর ট্রিলজি। বাংলা সাহিত্যে টানটান কাহিনির বড়ো অভাব। নিখুঁত প্লট রচনা ও ঘটনা পরম্পরায় কোনো গোঁজামিল না দেওয়াকে ব্যঞ্জনা ও দর্শনের নাম করে ফাঁকি দেওয়া হয় প্রায়শই। এমনকী ‘প্লট বা ‘কাহিনি’-কে ছোট করে দেখানো হয় এবং নাট সিঁটকানো-ও হয়ে থাকে। দীর্ঘ সাত-খণ্ড জোড়া গল্পের অজস্র চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য ছকে বেঁধে প্লটরচনার যে মুন্সিয়ানা রাওলিং দেখিয়েছেন তাতে জল মেশানো নেই একেবারেই। তিনি গল্প বলতে চেয়েছিলেন, কোনো ফাঁকি না দিয়ে গল্প শুনিয়েছেন। এখানেই তাঁর সিদ্ধি।

(দেশ : ১৭ জুলাই ২০০৭)

দুটি অভিমতই চরমপন্থী, সন্দেহ নেই। আর এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমরা আরেকবার ‘ঠাকুরমার ঝুলি’র সঙ্গে পটারকাহিনির তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করবো। এটা ভুলে গেলে চলবে না, তথাকথিত অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলাদের মুখের কথা, কল্পনার ভিতর থেকে জন্ম নেওয়া এই বাংলার রূপকথার সঙ্গে লণ্ডন-নিবাসিনী সুশিক্ষিতা রাউলিং-এর আধুনিক-রূপকথা তথা ফ্যান্টাসি অনেকটাই আলাদা। রহস্য, রোমাঞ্চ, জাদু বাস্তবতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যকে রাওলিং সচেতনে ভাবে বুনে দিতে পেরেছেন তাঁর এই ‘ফিক্‌শন’-এর ভিতরে। অন্যদিকে দক্ষিণারঞ্জনের বলেছেন :

‘লাল টুক্‌টুক্‌ সোণার হাতে কে নিয়েছে তুলি

ছেঁড়া নাতা পুরোণ কাঁথার –

**ঠাকুরমার ঝুলি!**

বাংলা-মা’র বুক জোড়া ধন –

এত কি ছিল ব্যাকুল মন!’

পিসিমার মুখে শোনা রূপকথার অচিনপুরের স্মৃতি আর স্বদেশীয় গ্রাম্যসাহিত্যের প্রতি নিবিড় অনুরাগে তিনি ‘ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে, রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।’ (রবীন্দ্রনাথ)

সেই প্রায় নিখুঁত মুখের ভাষার নমুনা :

‘কিন্তু ও বাবা! এক যে অজগর – গাছের গোড়ায় সোঁ সোঁ করিয়া সোঁসাইতেছে’ কিংবা ‘শুকের গলা ছিঁড়িল – রাক্ষসী গ্যাঁ গ্যাঁ করিয়া পড়িয়া মরিয়া গেল’।

তবে একালের গবেষিকা ঈশা পাল দক্ষিণারঞ্জনের রচনায় হুবহু মুখের ভাষা পাননি বলে মনে করেছেন। তিনি নিজের সংগৃহীত রূপকথার সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছেন, দক্ষিণারঞ্জনের মুখের ভাষাটিও লেখক নির্মিত মান্য বাংলাভাষা।

দ্বিতীয়ত, ‘ঠাকুরমার ঝুলি’র কাহিনি কি সত্যিই আজগুবি? রূপকের আবরণে আমরা যে ‘ছদ্মবেশী সত্যকথা’র কথা প্রথমেই বলেছি, ঠাকুরমার ঝুলি আসলে তাই। সোণার কাটী, রূপার কাটী, জীয়নকাটী, মরণকাটী, বুদ্ধু-ভুতুম-এর ছদ্মবেশ, গজমোতি, শুক-সারি, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, পক্ষীরাজে ওড়া, রাক্ষসীরাণীর সতীন পুতের মুণ্ডু চিবানো, মন্ত্র দিয়ে কাউকে পশু-পাখি বানানো (দ্র. ‘শীত বসন্ত’-এ দুয়োরাণীকে টিয়া বানানো), কলাবতী রাজকন্যরা কৌটোয় বাসা, ফণীর মণি, ডালিমকুমারের আয়ু ডালিমের বীজে আর রাণীর আয়ু পাশার ভিতরে, রাক্ষস-রাক্ষসীর আয়ু ভ্রমর-ভ্রমরার ভিতরে, রাক্ষসীর বমি করে ফেলা মানুষদের ফেরত দেওয়া, কথা বলা পাখি, গাছ ইত্যাদি কত রকম অবিশ্বাস্য অথচ অনিবার্য ঘটনা ঘটে ঠাকুরমার ঝুলিতে। কিন্তু এসবই কিছুটা বাস্তবের পুনর্নির্মাণ আর কিছুটা কল্পনার অতিরেক বই আর কিছুই নয়। সমাজের জাত-পাতের বৈষম্যের কথাও রয়েছে এখানে, বলেছেন গবেষক-অধ্যাপক মানস মজুমদার ব্যাঙ রাজপুত্রের সংলাপ উদ্ধৃত করে [আমি ব্যাঙ রাজার ব্যাঙ রাজপুত্র, এক কুনোব্যাঙী বিয়ে করেছিলাম, তাই বাবা আমাকে বনবাস দিলেন’ – দেড় আঙুলে]। ড. মজুমদার ‘শীত বসন্ত’ ও ‘কিরণমালা’ গল্পে যে রাণীকে টিয়া বানানো কিংবা দুই ভাই-কে পাহাড় বানানোর ‘ব্ল্যাক ম্যাজিক’ ও মন্ত্রপূত জলে স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার ‘হোয়াইট ম্যাজিক’এর কথা বলেন; পটার-কাহিনিতে তেমন হামেশাই ঘটে থাকে। ‘ঠাকুরমার ঝুলি’তে প্রেমের ছবিও উপেক্ষিত ছিল না : ‘রাজকন্যার আর ঘুম ভাঙে না, রাজপুত্রের চক্ষে আর পলক পড়ে না’(ঘুমন্ত পুরী)। হ্যারি পটারের উড়ন্ত ঘোড়া হিপোগ্রিফ, ইউনিকর্ণ, ফিনিক্স, জাদু ঝাঁটা, প্রাণকণা হরক্রাক্স, জাদু বলে নানা রকম প্রাণী হতে পারা, জাদু পাথর, ডেথলি হ্যালোজ় (বস্তু যা একত্রে মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পারে : আদি দন্ড, পুনরুজ্জীবক পাথর এবং অদৃশ্যকারী কাপড়), অদৃশ্য হওয়ার কাপড়, জাদু বড়ি বা জল, কথা বলা ছবি-মূর্তি-কাগজ এমনকি ম্যাজিক-ওয়ান্ড বা জাদু ছড়ির এবং প্রেমের ছবির সঙ্গে এই আদ্যিকালের রূপকথা গুলির উপাদানগত সাদৃশ্য রয়েছে যথেষ্ট। জাদু প্যাঁচা, নাগিনী, ময়ূরপঙ্ক্ষীর কথাও পাই পটার কাহিনিতে। শুধু আধুনিক সময়ে কল্পনার মাত্রা অনেক বেশি। তবে আমাদের রামায়ণ, মহাভারত কিংবা বিদেশের ইলিয়াড-ওডিসি ঘাঁটলেও পাওয়া যাবে এমন হাজারো অলৌকিকতা [উদা. উড়ন্ত পুষ্পক রথ, দুর্যোধনের দুর্বল ঊরুভঙ্গ, অ্যাকিলিসের দুর্বল গোড়ালি ইত্যাদি]।

তৃতীয়ত, মনে রাখা দরকার, অ্যালিস, ঠাকুরমার ঝুলি, টুনটুনির বইয়ের রূপকথাগুলি শিশু মনোরঞ্জনের জন্যই রচিত। মা-ঠাকুমাকে ঘিরে সন্ধেবেলা বা ঘুমের আগে বাচ্চাদের গল্প শোনার আবদারে তার সৃষ্টি। ফলত আকৃতিও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ। খোকা-খুকু ঘুমোয়, কাহিনি ফুরিয়ে যায়। পরদিন আবার শুরু হয় : এক রাজার দুই রাণী...। হ্যারি পটার-স্রষ্টা রাওলিং তিন সন্তানের মা। শোনা যায়, বাচ্চাদের জন্য গল্প বলার তাড়না থেকেই তিনিও পেয়েছিলেন তাঁর গল্পকে। তারপর ক্রমশ জনপ্রিয়তা আর কাহিনি বুনে যাওয়া। আসলে অশিক্ষিতপটুত্ব নিয়ে ঠাকুরমার ঝুলির অবিশ্বাস্য উপাদানগুলি তৈরি করেছিলেন বাঙালি মা-ঠাকুমারা। সেখানে বিদেশের সিণ্ডারেলা, স্নো হোয়াইট, হ্যানসেল গ্রেটেল, স্লিপিং বিউটি, থাম্বেলিনা ইত্যাদি রূপকথার সঙ্গে তার যথেষ্ট মিল (উত্তরকালে অবনীন্দ্রনাথের বুড়ো আংলার উপরেও দেড় আঙুলের প্রভাব আছে)। হান্স আন্ডারসন কিংবা অস্কার ওয়াইল্ডও লিখে গেছেন চমৎকার সব রূপকথা [দ্য আগলি ডাকলিং বা হ্যাপি প্রিন্স]। সৎ মার অত্যাচার সয়ে যাওয়া এবং পরে বিরাট সম্মান আর প্রতিপত্তি অর্জন করেও উদারহৃদয় থাকা বা যে সব থেকে বেশি অবহেলিত সেই একদিন প্রমাণ করবে সে ছাই চাপা আগুন, আবার কোনো এক রাজপুত্র এসে অসাধ্য সাধন করবে - এই ব্যাপারগুলো সর্বদেশের চিরকালের। পটার-স্রষ্টার ভিতরে এসবের উত্তরাধিকার বর্তেছিল। এমনকি পটারের জন্ম ও তার দ্বারাই ভোল্ডেমর্টের মৃত্যু হবে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী আমাদের মহাভারতের কৃষ্ণ-কংস মিথটিকে স্মরণ করায়। আরেকটু এগিয়ে দেখলে সুপারম্যান, স্পাইডারম্যান ও হি-ম্যানের উত্তরাধিকার ভারতীয় শক্তিমান ও অন্ধকারের রাজা কিলবিসের কাহিনিটিও হ্যারি পটারের পূর্ববর্তী কল্পনা। তাই হ্যারি পটারকে নস্যাৎ করার কোনো পরিকল্পনা আমাদের নেই। শুধু রাউলিং-এর কল্পনাপ্রতিভা ও রচনা-দক্ষতাকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়েও তাঁকে আমরা এই দেশ-বিদেশের মিথ-পুরাণ ও বিশ্বরূপকথার উত্তরজাতিকা বলতে চাই।

৮. তাই পটার-দুনিয়ার পাশাপাশি আমাদের বাংলাভাষার রূপকথার জগৎ এবং ভারতীয় জাদু বা ম্যাজিকের ঐতিহ্যও কোনো অংশে দীন নয়। বেতালপঞ্চবিংশতি থেকে আরব্য রজনী - কোথায় নেই ম্যাজিক? ভারতীয় ভোজরাজ ও তাঁর কন্যা ভানুমতী জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন : ভোজবাজি ও ভানুমতীর খেলা শব্দগুলি ম্যাজিকেরই নামান্তর। আধুনিক সময়ে আমরা পেয়েছি জাদুসম্রাট পি.সি. সরকারদের। তবু নব্যঔপনিবেশিকতা যখন আমাদের ঠেলে দিচ্ছে পরানুকরণের দিকে, তখন দেশীয় সাহিত্যের পুনর্পাঠ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। মধ্যযুগে তুর্কি আক্রমণের পর যে তথাকথিত বন্ধ্যাযুগ শুরু হয়, মুসলিম আধিপত্য বেড়ে যেতে থাকে, তখন অনুবাদ সাহিত্য ভারতীয় ঐতিহ্যের দিকে বাঙালিকে ফিরিয়ে এনেছিল, এও তেমনই। ভালো-মন্দের চিরকালীন লড়াই-কে মুখচ্ছদ হিসেবে রেখে ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ কিংবা ‘টুনটুনির বই’, ‘হ য ব র ল’ আমাদের স্বদেশীয় উত্তরাধিকার। আত্মবিস্মৃত বাঙালির এইসব বই পড়ার অভ্যাস কেন হারিয়ে যাচ্ছে তার পর্যালোচনা জরুরি। তবে রাওলিং এইসব কাহিনির অনুবাদ পড়েছিলেন এমন দূরকল্পনা আমরা করি না। কিন্তু বিদেশি রূপকথা বা হ্যারি পটার যে উন্মাদনা নিয়ে পড়ানো হয়, সেই একই রূপকথা বা লোককথা পুরনোকালের বলে বাতিলের দলে ফেলবো কেন? বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে এগুলি ফিরে আসা প্রয়োজন। তাই ভারতীয় ও প্রাচ্য-পুরাণ-কাহিনি, রূপকথা, ফ্যানটাসি, লোককথার ছাপা বই-এর সঙ্গে ই-বুক, সিনেমা, অ্যানিমেশন বা কার্টুনে যদি সেই পাঠকগ্রাহ্যতা ফিরিয়ে আনার ভূমিকা পালন করতে পারে, তাতে ক্ষতি নেই কোনো। তবে নিছক শিশুপাঠ্য নয় এইসব কাহিনি। তাই আমাদের দৈনন্দিনের বেঁচে থাকার জটিলতায় এইসব অসম্ভবের বাস্তব আর ছদ্মবেশী রূপকথা পড়লে, দেখলে আজও পাওয়া যাবে নির্মল আনন্দ। আর সমাজ-সংশোধনের ইশারা? সেও তো এক অতিরিক্ত পাওনা।

**ঋণস্বীকার :**

১) ঠাকুরমার ঝুলি / দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার / মিত্র ও ঘোষ / পঞ্চবিংশ সং / ১৩৭৯।

২) উপেন্দ্রকিশোর রচনাসংগ্রহ ১ / ২ : সাক্ষরতা প্রকাশন / ১৯৭৬।

৩) অ্যালিস অমনিবাস / জয়ন্ত চৌধুরী অনূদিত / এশিয়া পাবলিশিং হাউস/ ১৯৮৮।

৪) দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা, নিউজ বাংলা, সকালবেলা, একদিন, খবর ৩৬৫ দিন, টগবগ-এ প্রকাশিত ঠাকুরমার ঝুলি ও হ্যারি পটার বিষয়ক নিবন্ধ।

৫) ই-আর্টিকল / হাণ্ড্রেড ইয়ার্স অব ঠাকুমার ঝুলি : ফ্রম ওরাল লিটারেচার টু ডিজ়িটাল মিডিয়া / লোপামুদ্রা মৈত্র / ইণ্ডিয়ান ফোকলোর রিসার্চ জার্নাল -৭ / ২০০৭।

৬) রূপকথার উচ্চারণ / ঈশা পাল / সুবর্ণরেখা।

৭) রূপকথা / শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / একালের প্রবন্ধ সঞ্চয়ন / ক.বি.

৮) কতটুকু রূপকথা / তরুণ মুখোপাধ্যায় / সাহিত্য : পূর্ব ও পশ্চিম / ভাষা ও সাহিত্য।

৯) বাংলা সাহিত্যে রূপকথা চর্চা । মলয় বসু । কেপি বাগ্‌চি

১০) ভ্রমণে নয় ভুবনে / অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত / আনন্দ

১১) লোকঐতিহ্য-চর্চা / মানস মজুমদার / দে’জ।

১২) পাথার পেরোই রূপকথার / ঋতম্‌ মুখোপাধ্যায় / অকপটে / সকালবেলা : কলকাতা / ২৬ এপ্রিল ২০১২।

১৩) ঠাকুরমার ঝুলি বনাম হ্যারি পটার / খবর ৩৬৫ দিন ‘রবি’ / ঋতম্‌ মুখোপাধ্যায় / ৬ মে ২০১২।

১৪) সুকুমার রায়ের আশ্চর্য জগৎ / কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী / আনন্দ পাবলিশার্স / ১৯৮৩।

১৫) অবনীন্দ্র রচনাবলী। প্রকাশ ভবন। ১৯৮৭।

১৬) ইন্টারনেটে প্রাপ্ত নানাবিধ তথ্য ও হ য ব র ল, হ্যারি পটার ই-বুক, সিনেমা, ছবি।

আধুনিকতা ও জীবনানন্দ দাশ

অমিত ধাড়া

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়

আধুনিকতা ও জীবনানন্দ আলোচনার পূর্বে এ কথা জানা দরকার।আধুনিকতা কি? কোথা থেকে তার উৎস । ফিরে দেখা দরকার এই সময় কার দেশ,কাল,সমাজ,পাত্র এবং বিশ্বাস গুলি কে । জীবনানন্দ দাশের কবিতা পাঠে অগ্রসর হতে গেলে, প্রথমে ফিরেযেতে হবে আধুনিকতার উৎস ভূমিতে। বস্তুত জীবনানন্দের কবিতা অনুভব করতে গেলে ডারউইন, ফ্রেজার, ইউঙ প্রভৃতি কবিদের কাছে কিছু পেতে হবে এবং পাশাপাশি অনুভব করতে হবে বাংলার আবহমান ও সমকালীন জীবন চেতনাকে। বিবর্তনবাদ, মার্কসবাদ, ফ্রয়েডের মনস্তত্ব, ধনতন্ত্র , রাজতন্ত্র –এই মতবাদ গুলিকেও।সেই সময় এইসব ভাবনা গুলি কবি ও সাহিত্যিকদের বিশেষ ভাবে ভাবিয়ে তুলে ছিল। আর এই ভাবনার জায়গা থেকেই আধুনিক সাহিত্যের জন্ম। চেতন ও অবচেতন এর আলোআঁধারিতে গড়ে উঠে মগ্ন চৈতন্য। অপূর্ণ ইচ্ছা গুলি মনের অগোচরে জমা হতে থাকে আর সেই গুলিই মগ্ন চৈতন্য রূপে আমাদের মনলোকে প্রভাব ফেলে। সেই প্রভাব সাহিত্যেও পড়ে। নতুন নতুন ধর্ম, দর্শন, বিশ্বাস, আদর্শকে নতুন ভাবে দেখবার বাসনা থেকেই আধুনিক সাহিত্যের জন্ম। কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধোত্তর আর ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রভাব মুক্ত সাহিত্যকে আমরা আধুনিক সাহিত্য বলব।

রবীন্দ্রনাথ হল আধুনিক সাহিত্যের বন্দর বা প্রোতাশ্রয়, যার ভিত্তি প্রস্তুত করে ছিলেন তিনি নিজেই। তিনি একটা প্রেক্ষাপট বা আয়না, যাতে করে আধুনিকতার রূপচিত্রটি ফুটে উঠেছে। তাই সবকালেই তিনি সমান সত্যি, যাকে নিদিষ্ট কালসীমায় ধরা যায না।সমসাময়িক বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো কবিদের থেকে স্বভাব ধর্মে স্বতন্ত্র কবি জীবনানন্দ দাশ। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় আধুনিকতা ও জীবনানন্দের সৃষ্টি সম্ভার। কবি জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় আধুনিকতার অনবদ্য প্রয়োগ কোথায় কেমন ভাবে ঘটিয়ে তা দেখা দরকার।

জীবনানন্দ দাশের “সে দিন এ ধরণীর”( ঝরাপালক)-এর মতো কবিতায় ইয়ুঙ কথিত আদিম অবচেতনা বা আর্কিটাইপ্যাল-এর গুঞ্জন শোনা যায়।“ অবসরের গান”( ধূসর পাণ্ডুলিপি ), “মৃত্যুর আগে একদিন”- কবিতায় ফ্রয়েডীয় অবচেতন তত্ত্ব, স্বপ্ন তত্ত্ব, জীবন তত্ত্বের বিপুল বিস্তার বা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ‘বোধ’, স্বপ্নের হাত, ‘আট বছর আগে একদিন’, ‘গোধূলি সন্ধ্যার নৃত্য’- তেও এই একই সুর ধ্বনিত হয়। আর ‘পাখিরা’ ‘শকুন’ ‘ক্যাম্পে’ ‘বুনোহাঁস’ ‘শিকার’ ইত্যাদি কবিতায় প্রভাব ফেলেছে ডারউইন- এর বিবর্তনবাদ। মার্কস তাঁর চিঠিতে যেমন বলেছিলেন পৃথিবীর যে নিয়মাবলী আছে তার ভিতর থেকে গড়ে নেব নতুন এক নিয়মাবলী। অর্থাৎ এক কথায় তিনি মানব সভ্যতার ধারাবাহিকতাকেই স্বীকার করে নিয়ে ছিলেন। জীবনানন্দের ‘অবসরের গান’ এবং ‘১৯৪৬-৪৭ সাল’ এর মতো কবিতায় তার প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক কবিতার ভাবনা ভূমি গঠনে চার্লস ডারউইন এর অবদান বড় কম নয়। তাঁর ‘The Origin of Species By Means of Natural Selection’(1859)- আধুনিক কবিতার চিন্তা ভূমি গঠনে খুব কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কারন মানুষ ঈশ্বর সৃষ্টি নয় বরং বিবর্তনের পথে এসেছে এটা বৈজ্ঞানিক ধারনা জাত। প্রাকৃতিক বিবর্তন বাদের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায় জীবনানন্দের ‘পাখিরা’ , ‘ক্যাম্পে’, ‘হায় চিল’ কবিতায়।

জীবনানন্দের কবিতায় আধুনিকতা আলোচনা করতে গেলে ‘The Interpretation of Dreams’(1900) এর লেখক ফ্রয়েডকেও মনে রাখতে হবে। মনের আদ্ভুত অবচেতনার কথা তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন। অবচেতন ও অন্ধকার যে আমাদের কবির সৃষ্টির উৎস এবং সুন্দর ও কুৎসিত যে পরস্পর স্থানবদল করতে পারে সে কথা যেন ফ্রয়েড-ই আমাদের শিখিয়েছেন। ফ্রয়েড বলেন স্বপ্ন একমাত্র সত্য কারণ স্বপ্নই আমাদের আকাঙ্খা পূরণকরে। এই ধারণাকে আশ্রয় করে জীবনানন্দ লিখলেন ‘স্বপ্নের হাত’ –এর মতো কবিতা-----

পৃথিবীর বাধা---এই দেহের ব্যাঘাতে

হৃদয়ে বেদনা জমে; স্বপনের হাতে

আমি তাই

আমারে তুলিয়া দিতে চাই।

বলা বাহুল্য স্বপনের ধূসর জগতে সঞ্চরণ জীবনানন্দের কবিতার একটি মূল বৈশিষ্ট্য। এই কবিকে সু্ররিয়েলিস্ট কবি বলা যায় এবং সুররিয়েলিজম যে ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্ব ও মনোবিকলন তত্ত্বের ভিতর থেকেই জাত এ কথা বলাই যায়। স্বপ্ন বস্তু সমূহকে সংকেত রূপে তুলে ধরে সেই সঙ্গে জীবনানন্দ দাশও সাংকেতিক কবি। তাই জীবনানন্দের কবিতা বুঝতে গেলে আধুনিকতার উৎস মূলের স্থান বা পালাবদলকে বুঝতে হয়। কবির নির্মল, নিরাসক্ত দৃষ্টি ভঙ্গি তাঁকে আধুনিক কবিরূপে মর্যাদা দান করেছে। আসলে আধুনিক কবি হলেন বিরাট একটা স্পঞ্জের ন্যায় যা সর্ব জ্ঞান ও সর্ব প্রকরণকে শুষে নিতে পারে নতুন কিছু জন্ম দেবার প্রয়োজনে।

‘আধুনিকতার প্রতিস্পর্ধী রূপে আধুনিকতার উদ্ভব’-এ কথা বোদলেয়ার প্রবন্ধে স্বয়ং এলিয়ট বলেছেন। শাল বোদলেয়ারের গদ্য এবং কবিতার ভিতর দিয়ে আধুনিকতার শিল্প তত্ত্ব তিলে তিলে রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু আরাম্ভেরও আরাম্ভ আছে, এবং বোদলেয়ারের পূর্বে বোদলেয়ার স্বয়ং যাকে আবিষ্কার করে অধীর হয়ে ছিলেন সেই এডগার অ্যালান পো-কে আধুনিক কবিতার একজন আদি রূপকার বলা যায়।

এডগার অ্যালান পো এবং জীবনানন্দের মধ্যে কবি মানস ও ব্যক্তি মানসের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উভয়ের মধ্যেই আত্ম ধ্বংসী ও সৌন্দর্যবাদী প্রবণতা ভিতরে ভিতরে কাজ করেছে। পো ভুল ট্রেনে করে ভুল জায়গায় চলে যান এবং সেখানে অসহায় ভাবে মৃত্যুবরণ করেন আর জীবনানন্দ অদ্ভুত ভাবে ট্রাম চাপা পড়ে মারা যান। দুই জনেই আজীবন সৌন্দর্য ও স্বপনের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এক আবিষ্ট ও সম্মোহিত অস্তিত্ব যাপন করেন। পো-র কবিতায় সৌন্দর্যবাদ ও বিষণ্ণ আত্মানুসন্ধানের এর সঙ্গে জীবনানন্দের ‘ আট বছর আগে একদিন’, ‘বোধ’, কবিতার সৌন্দর্য সাধনা ও আত্মবৃত্তান্তের তুলনা চলে। এঁরা রূপে ভিন্ন হলেও স্বাদে এক। জীবনানন্দের সম্বন্ধে বলা যায় পো-র সাহিত্য সূত্র তাঁর ক্ষেত্রে মানিয়ে গেছে। ‘মৃত্যুর আগে’, ‘অবসরের গান’, ‘ক্যাম্প’, ‘আট বছর আগে একদিন’, অথবা ‘১৯৪৬-৪৭’ –এর মতো কবিতা লিখতে গিয়ে তিনি কোথাও খেই হারিয়ে ফেলেন নি। মূল অনুভূতিকে স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে বিকশিত করে শেষ পর্যন্ত একটি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় রচনার উপসংহারে উপনীত হয়েছেন। বলা যায় সৃজনের ঐকতত্ত্ব খুব একটা বিঘ্নিত হয়নি।

জীবনানন্দের ‘অবসরের গান’ কবিতাটি এই নতুন জীবন দর্শনেরই এক নতুন লিরিক প্রতিমা বলে গ্রহণ করা যায়------

“শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপর মাথাপেতে

অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের খেত,

মাঠে ঘাসের গন্ধ বুকে তাঁর- চোখে তার শিশিরের ঘ্রান

তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান

দেহের স্বাদের কথা কয়?

বস্তুত এখানে অনুপম ভাবে রচিত হয়েছে আধুনিক কবিতার আবহমণ্ডল, অলসতাতত্ত্ব- বিশ্রাম তত্ত্ব, উপভোগ তত্ত্ব। এক নতুন শিল্প দর্শন আমাদের মস্তিষ্কে অদ্ভুত স্বপ্নের সংকেত রূপে প্রেরণ করেছে সম্মোহন ও মোহমাদকতা নির্মাণে সফল হয়েছেন। শিরা ও স্নায়ুর এই এলিয়ে পড়া ভঙ্গীকাল ক্রমে হয়ে উঠেছিল আধুনিক কবিতার মূল সুর।

বাংলা কবিতার অক্ষর বৃত্ত ছন্দ, এই ভাব শিল্পে সার্থক আঙ্গিক শিল্প রূপে দেখা দিল। কারণ অক্ষর বৃত্তের মধ্যে রয়েছে এক বিলাস ধীরতা, জীবনানন্দ মূলত অক্ষর বৃত্ত এবং গদ্য ছন্দে তাঁর সামগ্রিক কবিতা লিখেছেন। সৌন্দর্যকে জীবনানন্দ শুধুমাত্র সৌন্দর্যের মধ্যে এবং জেগে ঘুমিয়ে থাকার অবস্থার মধ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কারণ একমাত্র আধুনিক কবিতাকে বলা হয়েছে অর্জনের কবিতা, বর্জনের কবিতা নয়। রোমান্টিক কবিদের মতো শুধু সুন্দরকে গ্রহণ করেননি, কুৎসিতের মধ্যেও তাঁরা অবিকার চিত্তে সৌন্দর্য অনুসন্ধান করেছেন। তাদের কবিতা কুৎসিত ও সুন্দরে মাখামাখি হয়েছে। ফলে জীবনের অর্থ পরিপূর্ণ হয়েছে। আর এই সম্বন্ধের নতুনতা জীবনানন্দের একাধিক কবিতায় দেখাযায়---- ‘মৃত গোক্ষুরার ফনা’, ‘যোনিচক্রস্মৃতি’, ‘আলেয়ার লাল মাঠ’, ‘কঙ্কালের রাশি’ ‘হেমন্তের হিম মাস’। তাঁর ‘আট বছর আগে একদিন’ কবিতায় নতুন বিষয় আবিষ্কার এবং সেই বিষয় কিভাবে কাজ করা যায় তিনি আমাদের দেখিয়েছেন---

“ কোনোদিন জাগিবে না আর

জানিবার গাঢ় বেদনার

অবিরাম অবিরাম ভার

সহিবে না আর -------”

শুধু ভাব প্রকাশে জীবনানন্দ আধুনিকতার প্রকাশ দেখাননি শব্দ প্রয়োগে আধুনিকতা দেখিয়েছেন। ভাষা কে নতুন ভাবে গড়ে নিতে হবে এই চিন্তাই কবিকে একজন ভাষাবিদ হতে প্রেরণা জুগিয়ে ছিল -----

হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙ্গল

বালটিতে টানিনি কি জল

কাস্তে হাতে কতোবার যাইনি কি মাঠে

মেছোদের মতো আমি কত নদীর ঘাটে ঘুরিয়াছি

পুকুরের পানা শ্যালা—আঁশটে গায়ের ঘ্রান গায়ে গিয়াছে জড়ায়ে

আধুনিকতার আর এক অন্যতম উপাদান রোমান্টিকতা। সেক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’ কবিতার রোমান্টিকতার অভিনবত্ব আমাদের অজানা নয়। আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে তো বটেই, প্রেমের কবিতার সর্বকালীন ইতিহাসেও জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’ এর দোসর খুঁজে পাওয়া ভার। এই কবিতার অসাধারন নির্মাণ নৈপুণ্য অতীত আর বর্তমান মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছে। কবি সমালোচক জগ্ননাথ চক্রবর্তী এই কবিতা সম্পর্কে একটি মত পোষণ করেছিলেন –‘ বনলতা সেন কবিতার মধ্যে খুব সুস্পষ্ট একটি প্রত্যাখ্যান রয়েছে। কবিতাটি যদি প্রেমের কবিতা হয় তবে তা ব্যর্থ প্রেমের কবিতা। কবিতাটি প্রেমের নয়, প্রেম অন্বেষণের কবিতা, কবি প্রেম প্রয়াসী এবং প্রেমের ব্যর্থতা থেকেই এই প্রেমের প্রয়াস।’ আসলে এই প্রেম অন্বেষণ- ই আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ। সেদিক থেকে ব্যর্থ প্রেমের কবিতাতেও কবি জীবনানন্দ দাশ আধুনিক ।

আধুনিকতা ও জীবনানন্দ আলোচনা করতে গিয়ে একথা বলা যায়, জীবনানন্দ সারা জীবন ধরে সৌন্দর্যের পূজা করেছেন। আর সৌন্দর্যের অন্বেষণ আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট একথা পো –থেকে জীবনানন্দ সকলেই জানতেন। কবি জীবনানন্দ তাঁর সাহিত্য রচনার সম্ভারে ভাবে, ভাষায়, অলংকারে, ছন্দ প্রয়োগ ও বিষয়বস্তুর আঙ্গিক নির্মাণে একজন আদ্যন্তই আধুনিক মানুষ ও কবি। সে কথা বুঝতে আমাদের অনেক কাল লেগেগিয়েছে। তাঁর কবিতায় জীবন প্রবাহের কথা বার বার উঠে এসেছে। কারণ কবি জানেন চলাই জীবন আর থেমে যাওয়াই মরণ। তাই একমাত্র কবি জীবনানন্দের পক্ষে বলা সম্ভব –‘মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়’।

গ্রন্থ ঋণ

১। চক্রবর্তী, সুমিতা : আধুনিক কবিতার চালচিত্র, সাহিত্য লোক।

২। চক্রবর্তী, সুমিতা : জীবনানন্দ সমাজ ও সমকাল, ১৯৮৭।

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত : আমার জীবনানন্দ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ,।

৪। মাইতি, প্রকাশ : জীবনানন্দ দাশের কবিতা শৈলীবিচার ও পাঠ বিশ্লেষণ, সাহিত্য সঙ্গী।

৫। মিত্র, মঞ্জুভাষ : আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরপীয় প্রভাব, দে’জ পাবলিশিং।

রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ

আশীষকুমার সাউ

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথ(১৮৬১) এবং স্বামী বিবেকানন্দ(১৮৬৩)- এই যুগ্ম নক্ষত্রের আর্বিভাব প্রায় একই সময়ে। আর আশ্চর্যের বিষয়, এঁদের জন্মস্থানও এক। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি আর সিমলা কলকাতা শহরে প্রায় একই অঞ্চল। দু’জনে বেশ কিছুদিন পাশাপাশিই থেকেছেন কলকাতায়। অনেকে ভাবেন, দু’জনের মধ্যে খুব মিল কিন্তু আশ্চর্য, দু’জনের মধ্যে সখ্য হল না, দু’জনেই দু’জনের সম্বন্ধে নীরব। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের নীরবতা নিয়ে নানা মন্তব্য, নানা অনুমান, এমনকি তির্যক টিপ্পনীও শোনা যায়। আজও যেন তার বিরাম নেই। এমন নয় যে এ আলোচনা সামান্যজনের গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গুণী মহলেও, গুণী মানুষের মুখেও শোনা যায় এমনতর মন্তব্য, যা বিচিত্র ইঙ্গিতবহ।

সত্যিই কি তাই?

ইতিহাস বলে, দু’জনের মধ্যে পরিচয়ই ছিল না শুধু, দেখা সাক্ষাৎও হয়েছে, ঘটেছে সম্বন্ধও। বাল্য বয়স থেকেই সংগীতচর্চা করতেন নরেন্দ্রনাথ। অতি সুকণ্ঠ ছিলেন তিনি। ধ্রুপদী সংগীতের চর্চা করতেন। তানপুরা নিয়ে গলা সেধেছেন ছেলেবেলা থেকে। গাইতেন নানারকমের গান। বাদ্যযন্ত্রেও আগ্রহ ছিল তাঁর। হাত পাকিয়েছিলেন তালবাদ্যে – পাখোয়াজ, তবলা। বাড়িতে সংগীতচর্চার ঐতিহ্য ছিল। এই গানকে সূত্র করেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের যোগাযোগ। ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত’ নাম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা পায়নি তখন, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু রবি ঠাকুরের গান কলকাতার গুণী মহলে অচেনা ছিল না। দুবছরের বড়ো রবীন্দ্রনাথের কাছে নরেন্দ্রনাথ এসেছেন সে গান শিখতে। গেয়েছেন বন্ধুমহলে, কখনওবা ছোটোখাটো ঘরোয়া আসরে। দু’জনে দুজনকে চিন্তেন,পরিচিত ছিলেন। গান নিয়ে কথাও হয়নি, এমনও নয়।

মনে রাখা ভালো, সাধারণ শহুরে বাঙালির মতো কর্মবিরল জীবন এঁদের নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের রচনার (বিচিত্র রচনার) তালিকাটি দেখলেই বোঝা যাবে কী পরিমাণ সময় দিতে হয়েছে সে কাজে। তার বাইরেও কাজ ছিল – নিজের বাড়িতে নিজের মতো করে নানা বিদ্যার চর্চা, ঘরোয়া আসরে, জোড়াসাঁকোর নিজস্ব উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যস্ততা- সৃজনধর্মী নানা কাজে বিজড়িত রবীন্দ্রনাথ কখনও সেকালের সাধারণ শহুরে বাঙালির মতো গল্পে আড্ডায় তাসপাশায় সময় কাটাননি। জ্ঞান আহরণের বিচিত্র উদ্যোগ তখন শুরু হয়েছে বিপুল বেগে।

সেকালেও সিমলা-জোড়াসাঁকোয় ছিল পায়ে হাঁটা দুরত্ব। ব্রাহ্মসমাজের মূল ধর্ম সমাবেশ-উৎসব জোড়াসাঁকোকে ঘিরে। সে ঐতিহ্য প্রাঙ্গণে আসেননি, এমন সম্ভ্রান্ত নাগরিক দুর্লভ। স্বয়ং রামকৃষ্ণ দেবেন্দ্র দর্শনে এসেছিলেন। তরুণ উদ্দীপ্ত নরেন্দ্রনাথও সংস্কৃতি, বৈদগ্ধ্য, কলাচর্চা, সাহিত্যরসের সন্ধানে অনেকের মতো এখানেও আসা-যাওয়া করতেন, তাতে অভিনব কিছুই নেই। ‘বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর’। সুতরাং সুপুরুষ প্রিয়ংবদ সুকণ্ঠ তরুণ নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির গান্ধর্ব সমাজের কাছে সমাদৃত হতেই পারেন, রবীন্দ্রনাথের রচিত সুরবিশোভন পরিশীলিত গান তাঁকে মুগ্ধ করবে, ব্রাহ্মদের বিশুদ্ধ গীতিচর্চা তাঁকে আকৃষ্ট করবে, তাও আশ্চর্য নয়। তবু ধীরে ধীরে এ আকর্ষণ শিথিল হয়ে এল, পরমহংসের অলৌকিক ব্যক্তিত্ব তাঁর অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দিল। সংসারলীলাকে সরিয়ে রেখে বিবেকানন্দ সন্ন্যাস জীবনকে বেছে নিলেন। ধর্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতাই তাঁর জীবনের নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠল। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও ‘প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে’ ঈশ্বরের জীবলীলার অমল মহিমা দু-চোখ ভরে উপভোগ করছেন। বিবেকানন্দের দিক থেকে অনেক দূরে বিসর্জিত সেই পথ। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর অসাধারণ বিশ্লেষণী প্রজ্ঞায় লিখেছেন, “ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বত্যাগ সন্ন্যাসী, আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ‘ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ।’ –এই দুই মহাগুরুর জীবনাদর্শের পার্থক্য তাঁদের পুত্র ও পুত্রাদপি প্রিয়তর শিষ্যের সম্পর্ক রচনায় প্রভাবশীল হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। -- মহর্ষির ব্রহ্মসমাজ আর ঠাকুরের শিষ্যসমাজের মধ্যে যে ব্যবধান, সেই ব্যবধানকে পশ্চাৎপটে স্থাপন করে বিবেকানব্দের ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে অগ্রসর হওয়াই সর্বভাবে সমীচীন।” তবু আশ্চর্যজনকভাবে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের জীবন-আখ্যানে আশ্চর্য সারূপ্য রয়েছে। ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শ ছিন্ন করে নরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ রূপে ভারতীয় হয়ে উঠলেন, বিশ্বধর্মসভায় হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করলেন, যে ব্যাখ্যা মনুষ্যত্বের, মানব সেবার। নরনারায়ণের সেবায় যিনি আত্মজীবনকে উৎসর্গিত করলেন সেই ভারতপুত্র বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনাকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন গোরা চরিত্র-চত্রিণে, ‘ভারততীর্থ’ ও ‘অপমান’ কবিতায় তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। পুনশ্চ জগদীশ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণ করিঃ

“ এ যুগে রবীন্দ্রনাথের বাণী বহন করছে তাঁর ভারততীর্থ। বিশ্বকবি ভারতভূমিতে যে বিশ্বমানবতার ধ্যান করেছেন তার মূলমন্ত্র হল ভারতধর্মই বিশ্বধর্ম। বিবেকানন্দও এই ভারতধর্মেরই জীবন্ত বিগ্রহ। এই অর্থেই তিনি ভারতপুরুষ। এদিক দিয়ে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখতে পাওয়া যাবে। বস্তুত ভারতধর্ম-চেতনায় বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথেরই আত্মার দোসর।”

রবীন্দ্রনাথের পড়াশুনার জগৎ সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই সঠিক ধারণা নেই। প্রচলিত পথে স্কুল কলেজে না গেলেও রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান আহরণের ব্যাপারটি ছিল একেবারে নিশ্চিদ্র। ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংগীত, ভূগোল, বিজ্ঞান বিবিধ বিষয়ে অজস্র গ্রন্থ পড়েছেন গভীর মনোযোগে। বিশেষ করে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, ব্রজবুলি, ইংরেজি, জার্মান আর ফরাসি ভাষার নিবিড় পাঠে মগ্ন থেকেছেন একসময় অগ্রজদের, বিশেষভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর সোমেন্দ্রনাথের সহায়তায় । আর ছিলেন অক্ষয় চৌধুরী অধীতব্য গ্রন্থের জোগান্দার। পরবর্তী জীবনে যেমন প্রথম চৌধুরী আর অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথের নিরবকাশ কর্মময় জীবন সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা থাকলে অনেক জল্পনার অবসান ঘটে। অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথও বিদ্যার্জন, সংগীত চর্চা, শরীর চর্চায় সময় দিয়েছেন, কিন্তু অব্যাবহিত পরেই পারিবারিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হয়েছেন। তারপর মহাপুরুষ-সান্নিধ্য জীবনকে ভিন্ন এক মাত্রা দিয়েছে।

এই দুই জীবনের দিকে তাকালেই সংশয়ের নিরসন ঘটে।

তারপর নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দে রূপান্তর, পাশ্চাত্যভ্রমণ, পশ্চিম ভূখন্ডে বেদান্ত প্রচার, প্রত্যাগমনের পর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহুধাবিচিত্র কর্মময়তা এবং শেষে অকাল প্রয়াণ। নিশ্ছদ্র এই জীবনে বহু অসম্ভবকে সম্ভব করে এই আকস্মিক অন্তর্ধান। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মন্তব্য করার অবকাশ এখানে কোথায়।

আর রবীন্দ্রনাথ? তিনিও পূর্ববঙ্গে বিচিত্র কর্মে অতিব্যস্ত। পাশাপাশি নিরলস সাহিত্য সাধনা। তারপর তো শান্তিনিকেতনে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা – নিদারুন অনটন, দেশবাসীর বিবিধ পেতিকূলতা, রাজনৈতিক আর্বত। আর তারই সঙ্গে একের পর এক পারিবারিক মর্মান্তিক বিপর্যয়-জীবনের অধি দেবতার ‘বেদনার দান’।

কিন্তু এরই মধ্যে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যাগমন সংবর্ধনায় নিজেকে যুক্ত করেছেন একথা স্মরণীয়। আর চিরস্বরণীয় তাঁর মনীষী রোম্যা রলাঁকে লেখা মন্তব্য- ‘যদি ভারতবর্ষকে জানতে চান তবে বিবেকানন্দকে জানুন। তাঁর মধ্যে সবই ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছু নেই।’

বিবেকানন্দের জীবৎকাল রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি অপরূপ সংগীতই ছিল বিবেকানন্দের চেতনায় রবীন্দ্রপ্রভাবের মুখ্য উপাদান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনও সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে বিবেকানন্দের মনোভাবের সাক্ষাৎ প্রমাণ মেলে না। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর তাঁকে নিয়ে কোনও স্বতন্ত্র প্রবন্ধ না লিখলেও তাঁকে ‘মহাত্মা’ বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে মিলনসাধনের পালাকে কবি যে তাঁর জীবনের পুরুষার্থ বলে মেনেছিলেন, সেই পালারই অন্যতম রূপকার হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দকে তাঁর জীবনাদর্শের পূর্বসূরির স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ১৩১৫ সালে (১৯০৮ খ্রিঃ) রবীন্দ্রনাথ ‘পূর্ব ও পশ্চিম’ প্রবন্ধে লিখেছিলেনঃ “ অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃতুয় হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনে উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।”

বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ ও সাধনতত্ত্বের এই যথার্থ ভাষ্য স্বামীজির উদ্দেশে কবির গভীর শ্রদ্ধার স্বীকৃতি। বিবেকানন্দ-সম্পর্কিত রবীন্দ্র-উক্তি নিতান্ত কম নয়। সে সবের সঙ্গে পরিচয় না রেখে কিছু মানুষ বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিস্পৃহ বিমুখ ঔদাসীন্যের অপবাদ আরোপ করে বড়ো আরাম বোধ করেন। তাঁরা অনুগ্রহ করে অধ্যাপক ‘জগদীশ ভট্টাচার্যের অগ্রন্থিত প্রবন্ধ’ নামের সদ্য প্রকাশিত সংকলন থেকে ‘বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ’ এবং ‘গোরা ও বিবেকানন্দ’ রচনা দুটি পাঠ করে নেবেন।

রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাঁর গান। ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত’ জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল। রবীন্দ্রনাথের ‘সত্যতম পরিচয়’ ওর মধ্যে নিহিত। এটি কবিরই কথা। সেই গানকে নরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যৌবনেই কণ্ঠে ধারণ করেছেন। আর সেই গান নিবেদন করেছেন গুরুর উদ্দেশে। একবার সেই দৃশ্য কল্পনা করুন-গায়ক নরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্থান দক্ষিণেশ্বর এবং শ্রোতা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সংগীতশ্রবণে তিনি সমাধিস্থ। এই অসামান্য ঘটনার পরেও কি সংশয় থাকে রবীন্দ্র-বিবেকানন্দের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে?

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনীকার রোম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গাঢ় সখ্যবন্ধন ছিল। রলাঁ-র সঙ্গে আলোচনাকালেও তিনি বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ উক্তি করেছিলেন। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, “শুধু শ্রদ্ধাই নয়, উভয়ের (বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের) মধ্যে নানা বিষয়েই মতের মিলও ছিল। শিক্ষা ও ধর্মের আর্দশ, স্বদেশ-চেতনা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক, দেশের দরিদ্র জনগণ সম্পর্কে গভীর মমত্ববোধ, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার প্রভৃতি নানা বিষয়ে সহযাত্রী কবি ও সন্ন্যাসীর মধ্যে আশ্চর্য ভাবসাদৃশ্য ও চিন্তার ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।’’

এদেশের মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণেও রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের সম্পর্কের মধ্যে প্রগতিশীল চেতনার পাঠোদ্ধার সম্পন্ন হয়েছে। মার্কসবাদী ইতিহাসবিদরা দেখিয়েছেন, বিশ শতকের শুরুতেই বিবেকানন্দের আকস্মিক জীবনাবসানে ভারতে প্রগতিশীল চিন্তাধারার একটি আলোকশিখা নিভে গেছে। তবু বাঙলার বিপ্লবীদের কাছে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সৈনিকদের কাছে বিবেকানন্দের নাম, বাণী ও আদর্শ ছিল অক্ষয় প্রেরণা জ্যোতি। আর তেমনই ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গান-বক্তৃতা, তাঁর ভাবমূর্তির আকর্ষণ তাঁদের কাছে তীব্র। রবীন্দ্রনাথ তো তখন জীবিত, ও ক্রমে হয়ে উঠেছেন বিশ্বকবি। তথাপি ক্রমাগত স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সংকল্প ও সাধনার উষর ভূমিখন্ডে তাঁর দেশগৌরবী সৃষ্টি শ্রাবণের ধারার মতো ঝরে পড়েছে। ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ ঠিকই শনাক্ত করেছিলেন যে “সমাজতন্ত্রী এবং মার্ক্সবাদী না হলেও বিবেকানন্দকে একজন গণতান্ত্রিক সমাজবিদ্রোহী বলা যায়।” রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও একইভাবে ব্লা যায়, মার্কসবাদী ও সমাজতন্ত্রী না হয়েও মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শের বর্ণমালা তাঁর চিন্তা ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ছিল। জাতপাত-ধর্মবুদ্ধি-বিড়ম্বিত সমাজব্যবস্থাকে তিনি ঘৃণা করে গেছেন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীর মতোই। বিবেকানন্দের মতোই রবীন্দ্রনাথও দরিদ্র নারায়ণের সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই লিখতে পেরেছিলেনঃ-

‘শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার

মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।’

এ ভাষার সঙ্গে বিবেকানন্দের উপলব্ধির বিরোধ ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে ভাবালু বাঙালিদের একাংশ শুধু রোমান্টিক কবিত্বের পীঠস্থানে এবং বিবেকানন্দকে সন্ন্যাসীর গৈরিক ভদ্রাসনে বসিয়ে তাঁদের বিপ্লবী চেতনাকে যেন জনসাধারণের কাছ থেকে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখেন। সে আড়াল দূর করার সময় এসেছে। আমরা ভুলে যাই, পরাধীন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামীরাই এক হাতে রবীন্দ্রনাথ, অন্য হাতে বিবেকানন্দকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে গেছেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি-সংগ্রামে। বিবেকানন্দের ভ্রাতা বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তো বিবেকানন্দকে সোস্যালিস্ট বলেই প্রচার করতেন। ভারতের যে কোনও নির্জন কারাকক্ষেই বন্দেমাতরম, বিবেকবাণী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং গান একই উদ্দীপনা সৃষ্টি করত। শুধু তাই নয়, বিবেকানন্দের পরম ভক্তশিষ্যা, সেই যে আয়ারল্যান্ডের নারী মার্গারেট নোবেল ‘ভগিনী নিবেদিতা’ নামে পরিচিত হয়ে এদেশে বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ-প্রচারে জীবন সমর্পণ করেছিলেন, তিনিও মঠাশ্রমের সংস্রব ত্যাগ করে ভারতের পরাধীনতা মোচনের বিপ্লবপন্থারই সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর নতুন নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ ‘লোকমাতা’ নামে এবং কথিত আছে, রবীন্দ্রনাথের মহান ভারত চেতনার যে অপরূপ প্রতিনিধি ‘গোরা’ উপন্যাস, সেই গোরা নিবেদিতারই কল্পমূর্তি। অন্যদিকে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের মতে, গোরা উপন্যাস ‘বিবেকানন্দ-নিবেদিতার দিব্যজীবনের মানবিক মহাভাষ্য’। নিগূঢ়তর বিশ্লেষণে আরও দেখা যাবে, গোরা ‘রবীন্দ্রনাথের মানসপুত্র, তাঁরই আত্মার দোসর।’

এইভাবেই রবীন্দ্রচেতনায় বিবেকানন্দের জীবন ও আদর্শ গভীরভাবে অনুসৃত হয়ে আছে। আপনার ভাব্জীবন ও বিবেকানন্দের কর্মজীবন সম্মিলিত হয়েছে গোরা চরিত্রের মধ্যে। পূর্ণ মনুষ্যত্বের দীক্ষা ও শিক্ষার বাণী উৎসারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ এই দুই মহামানবের কণ্ঠ ও কর্ম থেকে। রবীন্দ্রনাথ গড়েছিলেন শান্তিনিকেতন। আর বিবেকানন্দের সংঘশক্তি সারা দেশে সেবার ও শিক্ষাদানের যে নিটোল শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিষ্ঠান-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, তার কোনও বিকল্প নেই। রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দই ভারতে শিক্ষার সমাজিকীরণের প্রবর্তক।

আর একটি কথা বলে বক্তব্য শেষ করা যেতে পারে-

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ দ’জনের সৃষ্টিও তো আমাদের কাছেই আছে। উভয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে সমস্ত সংশয়ের নিরসন হয়ে যায় সেই রচনা সম্ভারের দিকে দৃষ্টি দিলে। জীবন-চিন্তা, সমাজ-চিন্তা, স্বদেশ-চিন্তা, শিক্ষা-চিন্তার ক্ষেত্রে উভয়ের অমিল নয়, নিবিড় নৈকট্যেই আমরা বিস্মিত হই। অনেক সময় মিল যেন রেখায় রেখায়। স্বদেশ, সমাজ, শিক্ষা-প্রসঙ্গে দু’জনের কণ্ঠস্বর একেবারেই এক। তাই নির্দ্ধিধায় বলি, দূরত্ব নয় আশ্চর্য নৈকট্যই আমাদের বিস্মিত করে তোলে।

দু’জনের ব্যক্তিত্বে পার্থক্য আছে। একজন কবি, অন্যজন সন্ন্যাসী, কিন্তু চিন্তার জগতে তাঁদের অধিষ্ঠান একাসনে। দু’জনেই ছিলেন একই পথের পথিক। তাই তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি আমরা সর্বদা জ্ঞাপন করি, এবং তাঁদের পায়ে মাথা ঠেকাই।

**রবীন্দ্র সাহিত্যে সন্ত চেতনা : বহুমুখী সৃষ্টির আর এক দিক**

**ড. সোমা দত্ত**

মহিলা মহাবিদ্যালয়

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ও নানা সম্প্রদায়েত নানা ভাষার মানুষের বাস। তবে সকল বিভিন্নতার মাঝে ঐক্যের সুর ধ্বনিত। সকলেই যেন ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। তাই তো বিশ্বে ভারতবাসীর ও ভারতবর্ষের স্থান বিশিষ্ট। যাঁদের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হলেন মানবতাবাদের সাধক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বাস একতায়, ঐক্যে। তাই তো তিনি ভারতমাতার অভিষেকের তরে ভারতবর্ষের মানুষমাত্রকে একত্রে মিলিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন ‘ভারততীর্থ’ কবিতায়-

‘এসো হে আর্য, এসো অনার্য হিন্দু মুসলমান।

এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিষ্টান।

এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন, ধরো হাত সবাকার,

এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার।

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা

সবার-পরশে-পবিত্র করা তীর্থনীরে

আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।’

রবীন্দ্রনাথ এক ধর্ম, এক জাতিতে বিশ্বাসী। তাঁর নিকট মানুষের একটাই ধর্ম। তা হল মানুষের ধর্ম, মনুষ্যত্বের ধর্ম। জাতি একটাই- মনুষ্যত্বের জাতি।

রবীন্দ্রনাথের অভিমত অনুসারে যা মানুষকে ত্যাগ ও তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাই মানুষের ধর্ম। এর জন্য প্রয়োজন সর্বকালীন মানবের সাধনা। যার বাস মানুষ মাত্রের অন্তরে। সেই অন্তরের মানবকে মানুষ নানা নামে পুজো করে। আমাদের তাঁকে নিজের অন্তরে অনুভব করতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। সেই উপলব্ধিই প্রকৃত সত্য, প্রকৃত ধর্ম, প্রকৃত জাতি। আর সব কিছুই বাইরের ব্যাপার মাত্র। এই সত্যের উপলব্ধি হলে তবেই মানুষ জীবসীমাকে অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু এই রূপ উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নয়। এর জন্য মানুষকে অন্যের আত্মার জন্য অন্যের আত্মাকে, নিজের আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে জানতে হবে। তবেই সে মহাসত্যকে জানতে পারবে। এরজন্য মানুষকে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ স্বার্থ ত্যাগ করে সকলের হিতার্থে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। তবেই জীবসীমাকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবে উপনীত হওয়া যাবে। এরজন্য প্রয়োজন জীবমাত্রের প্রতি প্রেমের ভাব। এরজন্য মানুষকে অহম্-এর বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তি আমিকে অতিক্রম করে সর্বজনীন আমিকে জানতে হবে। তবেই উপলব্ধি করতে পারা যাবে সেই বিশ্বমানবকে আর প্রতিটি মানুষ বলতে পারবে ‘সোহহম্’। অর্থাৎ আমি তারই অংশ।

রবীন্দ্রনাথের নিজের যেমন সর্বধর্ম সমন্বয়য়ের ভাবে, সকল মানুষের প্রতি সমভাবে, এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তিনি তেমনই মনোভাব প্রতিফলিত হতে দেখেছিলেন মধ্যযুগের রচনায়। এইজন্যই তিনি তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সপ্তবানীতে রবীন্দ্রনাথ শুনতে পেয়েছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিধ্বনি। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের কথা বলতে গিয়ে সন্তকবিদের স্মরণ করেছেন। তাঁদের কথা বলেছেন। সন্তদের রচনায় ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শের ধারা প্রবাহিত হতে দেখে এঁদের ‘ভারতপথিক’ নামে বিশেষিত করেছেন।

ভারতপথিক সন্তরা চিরকালের ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী রূপেই রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা দিয়েছিল। তাঁর বিভিন্ন কাব্যে, প্রবন্ধাদিতে মধ্যযুগের কবীর, নানক, দাদূ, রবিদাস, সুন্দরদাস, নামদেব প্রমুখ সন্তসাধকদের নাম বিশেষ প্রসঙ্গে বারংবার উল্লেখিত হয়েছে; তাঁদের জীবনাদর্শ অবলম্বনে পৃথক কাব্য বা প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ বহু সন্ত-কবির বাণীর অংশ বিশেষ তাঁর নানা রচনায় প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত করেছেন, আবার অনেকগুলি সন্তবানীর বঙ্গানুবাদও করেছেন তিনি; কবীরের একশটি দোঁহার ইংরেজি অনুবাদ ‘One Hundred Poems Of Kabir’ প্রকাশ করে কবীর-বাণীর সঙ্গে বিশ্ব বাণীর পরিচয় ঘটিয়েছেন ‘One Hundred Poems Of Kabir’ (১৯১৪খ্রি) গ্রন্থটি পাশ্চাত্য জগতের কাছে ভারতীয় সন্ত সাধকদের পরিচিতির দ্বার উন্মোচন করেছে। এরপর পৃথিবীর বহু ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। বহু গবেষক, লেখক এই গ্রন্থের মাধম্যেই ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।

বাংলায় মধ্যযুগের হিন্দি সন্তসাধকদের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনও হিন্দি সন্তদের সম্পর্কে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁদের অমূল্য বাণী সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। এছাড়াও ভারতীয় সাধনার বিশিষ্টতাকেও তিনি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন দুজনেই কবীর দাসের বাণীর অনুবাদ করেছিলেন। এক্ষেত্রে উভয়েই পরস্পরের প্রেরক ও সহায়ক ছলেন। এইভাবে ক্ষিতি মোহন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের ভারতীয় সন্ত সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রটি বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

মধ্যযুগের সন্তকবিদের বাণীতে অতি উদার বিচার ধারার সঙ্গে কাব্য সৌন্দর্যের প্রকাশও রবীন্দ্রনাথকে স্বাভাবিকভাবে মুগ্ধ করেছিল। কারণ অলঙ্কার-ছন্দ ও বিভিন্ন রসের সংযোগে সন্তকাব্য প্রায়স্যই শিল্প সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তাই তাঁদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অভিব্যাক্ত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন কাব্য, চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদিতে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে- ভারতবর্ষে গৌরবগাথার বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সন্তদের স্মরণ করেছেন; ভারতীয় সাধনার ধারার বর্ণনা প্রসঙ্গেও তিনি সন্তদের বাণীর ও নামের উল্লেখ করেছেন, ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ভারতীয় ধর্ম, মানবতার ধর্ম, ঐক্য প্রভৃতি- বিষয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি সন্তদের নাম ও বাণীর উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের শিখ ধর্মের প্রতি আবাল্য শ্রদ্ধা ছিল। শিখগুরু ও শিখ জাতির আত্মোৎসর্গ ও বীরত্ব তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তাঁর অনেকগুলি রচনা এঁদের নিয়ে- ‘কাজের লোক কে’ (১৮৫৫ খ্রি), ‘বীরগুরু’ (বালক, শ্রাবণ ১৮৮৫খ্রি), ‘গুরু গোবিন্দ’ (১৮৮৮খ্রি), ‘শেষ শিক্ষা’ (১৮৯৯খ্রি), ‘বন্দীবীর’ (১৮৯৯খ্রি), ‘প্রার্থনাতীত দান’ (১৮৯৯ খ্রি), ‘নিস্ফল উপহার’ (১৯০০খ্রি), ‘শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ’ (১৯০১ খ্রি)। এছাড়াও ‘সাকার-নিরাকার’ (১৮৯৯ খ্রি) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাকার-নিরাকার তত্ত্বে আলোচনা প্রসঙ্গে নানকদেবের নাম উল্লেখ করেছেন।

‘শিক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধে ভারতবর্ষের শিক্ষা অব্যবস্থা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সন্ত কবীরদাসের একটি বিখ্যাত বাণীর অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন-

“পানী মে মীন পিয়াসি,

সুনত সুনত লাগে হাসি।”

অর্থাৎ জলের মধ্যে থেকেও মাছ তৃষ্ণার্ত, শুনে হাসি পায়। ভারতবর্ষের মতো শিক্ষিত দেশের বহু মানুষ আজও অশিক্ষিত রয়ে গেছে শুনে হাসিই পায়। রবীন্দ্রনাথ কবীরদাসের জীবনের একটি আলেখ্য নির্মাণ করেছেন এটা ‘অপমানবর’ কবিতাটিতে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস’ (১৯০২ খ্রি) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস কি, সে বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সন্ত সাধকদের কথা বলেছেন এবং কবীর, নানক, চৈতন্য এবং তুকারামের উল্লেখ করেছেন। স্বদেশী সমাজ’ (১৩১১ বঃ) প্রবন্ধে নানক পন্থী ও কবীর পন্থীর উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, কবীরদাস কে পুনরায় স্মরণ করেছেন জাগরণ’ (১৯১০ খ্রি) প্রবন্ধে ছোট আমি ও বড় আমির দ্বন্দ্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এবং তাঁর বাণীর দুটি ছত্র বিশেষের উল্লেখও করেছেন-

“জব হম রহল রহা নহিঁ কোঈ

হমরে মাহ রহল সব কোঈ।”

অর্থাৎ যখন আমি ছিলাম, তখন কেউ ছিল না। আবার আমার মধ্যেই সকলে সমাহিত।

আত্মবোধ’ (১৯১০ খ্রি) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে সন্ত জ্ঞানদাসের উল্লেখ করেছেন। পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি’ (১৯২৫ খ্রি) প্রবন্ধে মধ্যযুগের আর্থিক রাজনৈতিক ও ধার্মিক বিরোধের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সন্ত দাদূ ও কবীরদাসের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন। ‘ভারত পথিক রামমোহন রায়’ প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক কুসংস্কার ও জড়ত্ব দূর করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সন্ত কবীরদাস, রজ্জব, দাদূ ও দয়ালের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণ করেছেন।

‘মানুষের ধর্ম’ (১৯৩৩ খ্রি) গ্রন্থে যথার্থ সত্য নিরূপণ প্রসঙ্গে, বিশ্বসত্যের শক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রজ্জব, রামানন্দ, কবীরদাস ও রবিদাসের নামের উল্লেখ করেছেন; রজ্জবের বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন-

“সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ, না মিলৈ সো ঝূঁঠ।

জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রুঠ।”

‘সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে; রজ্জব বলেছেন, এই কথাই খাঁটি- এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই কর।’

তাঁদের উপদেশের একাধিক উদ্ধৃতিও দিয়েছেন, রজ্জবের একটি উদ্ধৃতি হল- ‘সব ঘট একৈ আত্মা ক্যা হিন্দু-মুসলমান।’

‘মহাত্মা গান্ধী’ (১৯৩৬ খ্রি) প্রবন্ধের রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর অহিংস ধর্মের উপর খ্রিস্ট সাধক টলস্টয়ের প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে দাদূ, কবীর, রজ্জব প্রমুখ মধ্যযুগের সন্তসাধকদের নাম ও শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করেছেন। ‘রূপশিল্প’ (১৯৩৯ খ্রি) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাহিত্যশিল্পে মাহাত্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে কবীর দাসের পদের দুটি ছত্রের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করেছেন। সেই ছত্র দুটিরই পাঠান্তর পাওয়া যায় সাহিত্য’-এর মূল প্রবন্ধে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত দুটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ ক্রমে প্রেমদাসের রচনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

‘রাজাপ্রজা’ গ্রন্থের ‘পথ ও পাথেয়’ (১৯০৮খ্রি) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক দুঃব্যবস্থা ও ঐক্য স্থাপনে মধ্য যুগের হিন্দি সন্ত কবিদের ভুমিকার কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন। ‘রসের ধর্ম’ (১৯০৯খ্রি) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ হৃদয় প্রসারের গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে নানক রামানন্দ কবীরদাস প্রমুখ সন্তদের শ্রদ্ধা সহ স্মরণ করেছেন। কারণ তাঁদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ সেই হৃদয় প্রসারই লক্ষ করেছেন। ‘ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সত্য ও সত্য প্রকাশের আলোচনা প্রসঙ্গে কবীর, নানক, দাদূ, রবিদাস প্রমুখ সন্তদের নাম উল্লেখ করেছেন। পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘শুচি’ (১৯৩২খ্রি) কবিতায় যথার্থ শুচিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ ও কবীরের নাম উল্লেখ করেছেন। ‘স্নান সমাপন’ (১৯৩২খ্রি) ও ‘প্রেমের সোনা’ (১৯৩২খ্রি) কবিতাতেও রামানন্দের কথা আছে।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের ‘দাদূ’ (১৯৩৫খ্রি) গ্রন্থের ভূমিকায় সন্ত জ্ঞানদাস, কবীর ও নানকের প্রসঙ্গ এসেছে। এছাড়াও হরিনারায়ণ শর্মা সম্পাদিত ‘সুন্দর গ্রন্থাবলী’র স্বলিখিত প্রাক কথনে সুন্দরদাসের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। হিন্দি গ্রন্থাবলীতে প্রাক কথন রবীন্দ্রনাথ বাংলায় লিখেছিলেন। মধ্যযুগের হিন্দি সন্ত সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়- তাঁর দুই পৃষ্ঠার তিন লাইনের প্রাক কথনে।

রবীন্দ্রনাথ কাশীতে উত্তরভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা পড়ে সাহিত্যের পথে গ্রন্থের পরিশিষ্টে ‘সভাপতির অভিভাষণ’ নামে প্রকাশিত হয়। এই বক্তৃতায় হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের তাঁর পরিচয়ের কথা রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন এবং তিনি জানিয়েছেন যে প্রাচীন হিন্দি কবিদের গান তাঁর চির আধুনিক বলে মনে হয়।

কবীর, নানক, জ্ঞানদাসের কিছু পদের বঙ্গানুবাদও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই অনুবাদিত পদগুলি প্রথমে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে। পড়ে এগুলি ‘রূপান্তর’ গ্রন্থে সংকলিত হয়। একটি শিখ ভজনের রবীন্দ্রকৃত বাংলা অনুবাদের অংশ বিশেষ এই রকম-

‘বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে-

অমল কমল- মাঝে, জ্যোৎস্না রজনী- মাঝে,

কাজলঘন মাঝে, নিশি আন্ধার-মাঝে,

কুসুমসুরভি-মাঝে, বীণারণন শুনি যে

প্রেমে প্রেমে বাজে’।

মূল ভজনটি-

‘বাদৈ বাদৈ রম্যবীণা বাদৈ

অমল কমল বিচ

উজল রজনী বিচ

কাজর ঘন বিচ

নিশ আধিয়ারা বিচ

বীণারণন সুনয়ে।

বাদৈ বাদৈ রম্যবীণা বাদৈ’

সন্ত কবিদের রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে আন্তরিক ভাবে আগ্রহী ছিলেন তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু হিন্দি সন্ত সাধকদের রচনায় নয়, মারাঠি সাধক কবি তুকারাম অ মৈথিলী ভক্ত কবি বিদ্যাপতি যথাক্রমে পনেরোটি অভঙ্গের ও পঁয়ত্রিশটি পদের বঙ্গানুবাদ রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। বেদ-সংহিতা-উপনিষদ, ধম্মপদং মহাভারত, মনুসংহিতা প্রমুখ ধর্ম কাব্যের অংশ বিশেষও রবীন্দ্রনাথ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন কাব্য ও মধ্যযুগের সন্ত কাব্যের চর্চা রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবৎকালে শেষ পঞ্চাশ বছর ধরে করে গেছেন।

সমাজে মানুষকে মূল্য না দিয়ে যখনই প্রতিষ্ঠা, সম্পদ, ক্ষমতার অহঙ্কার মাথা তুলে দাঁড়ায়, বিষবাস্পে পরিবেশ কলুষিত হয়, তখনই প্রয়োজন হয় ভক্তি সঙ্গীতের, যেখানে মানুষকে সম্মান দেওয়া হয়েছে, সে যে বিরাটের অংশ এবং বিরাট তার মধ্যেই সমাহিত- একথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের মূলে রয়েছে মানবিকতার ধর্ম, ঐক্য, সামঞ্জস্যের ভাবধারা তারই প্রতিভূ এবং রবীন্দ্রনাথ ও ছিলেন সে সংস্কৃতির উত্তরসূরী। রবীন্দ্রনাথের চেতনায় সন্ত কাব্যের অবস্থান তাই বিশিষ্ট। মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় বলতে গিয়ে মানবতার সাধক মধ্যযুগের সন্তদের প্রসঙ্গ অনায়াসে এসে যায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’

উপন্যাসে লোকসংস্কৃতি : একটি সাধারণ পাঠ

মনোজিৎ রায় গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের ধাঁচে রচিত ‘পথের পাঁচালী’(১৯২৯) তাঁর রচনা সম্ভারের মধ্যে তথা বাংলা সাহিত্যে একটি কালজয়ী উপন্যাস। লেখক বা ঔপন্যাসিক যখন তাঁর ফেলে আসা দিনের অভিজ্ঞতা, অতীতস্মৃতি রোমন্থন করে পাঠকের সঙ্গে গড়ে তোলেন এক নিবিড় পরিচয় তখন তা হয়ে ওঠে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এই জাতীয় উপন্যাসে লেখক বা ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিজীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা সমূহ বিভিন্ন চরিত্রের ফেলে আসা দিনগুলির মধ্যে স্মৃতিচারণের মাধ্যমে ঘটে থাকে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৪-১৯৫০) ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসটি রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে । লেখকের বয়স তখন মাত্র তিরিশ(৩০) বছর পাঁচ(৫) মাস এবং ছাব্বিশ(২৬)শে এপ্রিল,১৯২৮ তারিখে তিনি ‘পথের পাঁচালী’ র পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত করেন। উপন্যাসটির ‘জাত’ নির্বাচনে এক মত পোষণ করা বড়ই দুঃসাধ্য । তবে, উপন্যাসটিতে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের অনেক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

ব্যক্তিজীবনে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অধিক সময় কাটিয়েছেন গ্রামে । জীবনের অনেক কাছ থেকে গ্রাম বাংলার চাল-চলনকে পরখ করেছেন । তাঁর জন্মভূমি কাচড়াপাড়ার সমীপবর্তী ঘোষপাড়া মুরাতিপুর গ্রামে । তাঁর পিতার আদি নিবাস যশোহর জেলায় সে অঞ্চলটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত । ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাস রচনায় লেখনি ধরার আগেই বিভূতিভূষণ ঘুরে নিয়েছেন বাংলা, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা ও আরাকানের অনেক গ্রাম, দীর্ঘ কাল কাটিয়েছেন ভাগলপুরে । যার সুবাদে গ্রাম বাংলার লোকসংস্কৃতি ছিল তাঁর নখদর্পণে । ফলে তাঁর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের নানা ঘটনায় ।

শিষ্টসাহিত্য ও লোকসাহিত্য সম্বন্ধে পাঠকবর্গের মননে সর্বদাই দুটি পৃথক পৃথক সিদ্ধান্ত কাজ করে । অনেকের ধারণা লোকসাহিত্য অলিখিত ও মৌখিক, পল্লীকেন্দ্রিক জীবন, নিরক্ষর জনের পাঁচালী, নব নব রূপ লাভ করে, প্রকাশ ভঙ্গির স্বল্পতা, ঐতিহ্য নির্ভর, সমষ্টি নির্ভর, পরিবর্তনশীল, নমনীয়, স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর ইত্যাদি । অন্যদিকে, শিষ্টসাহিত্য বা নাগরিক সাহিত্য বা অভিজাত সাহিত্য লিখিত ও মুদ্রিত, নগরকেন্দ্রিক জীবন, সাক্ষর জনের সৃষ্টি, চিরায়ত রূপ লাভ করে, প্রকাশভঙ্গির দীর্ঘতা, সমকাল ধর্মী, ব্যক্তি নির্ভর, অপরিবর্তনশীল, অনমনীয়, লিপি ও মুদ্রণ নির্ভর। কিন্তু, একটা সময় এই সমস্ত যুক্তির কিঞ্চিৎ মাত্র যৌক্তিকতা থাকলেও সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিগুলি ভিত্তিহীন হতে চলেছে। যার দৃষ্টান্ত অনেক আগেই পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ মন্তব্যে। তিনি তাঁর ‘গ্রাম্যসাহিত্য’ প্রবন্ধে বলেছেন “গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তেমনই সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে – তাহা বিশেষ রূপে – সংকীর্ণ রূপে দেশীয় স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তিগম্য, সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক, তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকটার উপর দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ নিম্ন সাহিত্য এবং উচ্চ-সাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটা যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে, তাহার ফুল ফল ডাল পালার সঙ্গে মাটির নিচেরকার শিকড়গুলার তুলনা হয় না – তবু তত্ত্ববিদের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।’’ শুধু তাই নয়, নিজের মন্ত্যবের স্বপক্ষে জোড়াল দাবী যে জানিয়েছেন তাও জানা যায় উল্লিখিত প্রবন্ধেরইএক দীর্ঘ প্রত্যুক্তিতে – “নিচের সহিত উপরের এই যে যোগ প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কনের কবি যদিচ রাজসভা ধনীসভার কবি, যদিচ তাঁহারা উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশি দূর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই । অন্নদামঙ্গলে ও কুমারসম্ভবের আখ্যানে প্রভেদ অল্প, কিন্তু অন্নদামঙ্গল কুমারসম্ভবের ছাঁচে গড়া হয় নাই। তাহার দেব-দেবী বাংলা দেশের হর-গৌরী। কবিকঙ্কন চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা সমস্তই গ্রাম্য কাহিনী অবলম্বনে রচিত। সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়। রাজসভার কাব্য ছন্দ মিল ও কাব্যকলা সুসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রাম্য ছড়াগুলির সহিত তাহার মর্মগত প্রভেদ ছিল না।’’

সংস্কৃতি শব্দটি বিস্তৃত। সেই সঙ্গে আপেক্ষিকও বটে। আধুনিকতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়ে থাকে। কোনও দেশের বা অঞ্চলের আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি, ঘর-বাড়ি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ধর্ম-সংস্কার, কলা-কৌশল, শিল্প-বাণিজ্য, আসবাব-পত্র ইত্যাদি সেই দেশের বা অঞ্চলের সংস্কৃতি বা লোকসংস্কৃতির পরিচায়ক লোকসংস্কৃতির বিষয়গুলো হল –লোকাচার(Folk-Customs),লোকোৎসব(Folk-Festivals),লোকনৃত্য(FolkDance), লোকশিল্প(Folk-Arts),লোকধর্ম(Folk-Religions),লোকসংস্কার(Folk-Superstitions), লোকবিশ্বাস(Folk-Belief), এবং লোকসাহিত্য(Folk-Literature) । আবার লোকসাহিত্যের বিষয়গুলি হল – ছড়া(Rhyme), প্রবাদ (Proverb), ধাঁধা(Riddle), উপকথা বা রূপকথা(Folk-Tale),ব্রতকথা, মন্ত্র(Charms),লোকসংগীত(Folk-Song) ইত্যাদি। মোটকথা লোকসংস্কৃতির বিষয়টিকে যদি দুটি কোণ থেকে আলোচনা করা যায় তবে একটি কোণে অবস্থান করবে বস্তুকেন্দ্রিক বা আচার-আচরণ কেন্দ্রিক সংস্কৃতি অপর কোণটিতে অবস্থান করবে বাক্ কেন্দ্রিক । আবার অনক ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে একই বিষয়ের মধ্যে দুই-এর অবস্থান । যেমন – ‘ব্রতকথা’ ; এখানে ব্রতের আচার-আচরণ বস্তুকেন্দ্রিক বা আচারকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি এবং ব্রতের উপলক্ষে যে মন্ত্র বা গান তা অবশ্যই লোকসাহিত্য ।

‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান পাওয়া যায় । উপন্যাসের আবর্তন-বিবর্তন সবটিই হরিহর-সর্বজয়ার সাংসারিক জীবন-যাপনকে কেন্দ্র করে হয়েছে। সেই সঙ্গে আছে দুর্গা-অপুর বাল্যজীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী । আর তার পশ্চাতে রয়েছে লেখকের অতীত জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতি । হরিহর-সর্বজয়া-দুর্গা-অপু চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্টের বর্ণনায় এসেছে নিশ্চিন্দিপুরের অনেক উপজাতীর লোকাচার, লোকোৎসব, লোকবিশ্বাস, লোকদেবতা, লোকৌষধ, লোকসংস্কার এবং লোকসাহিত্য ।

উপন্যাসটির পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে একটি উপকাহিনিতে দেখা যায় গোকুল ও তার স্ত্রীর কলহ-বিবাদ, তাতে লোকসংস্কৃতির সুন্দর দৃষ্টান্ত উঠে আসে – “আজ তিন দিন ধরে ধানগুলো রোদ্দুরে দেওয়ার জন্যে বল্লে হয়রান – এই মেঘলা যাচ্ছে , এরপর ধানগুলো যদি কলিয়ে যায় তবে তোমার কোন বাবা এসে সামলাবে ?...সারাবছরের পিণ্ডি জুটবে কোত্থেকে ।’’ আবার ক্ষনিক বাদেই দেখা যায় – “দ্যাখো না একটা ডোল ধান, বীজধান, জল পেয়ে যদি কলিয়ে যায়, ও কি আর রোয়া হবে ? আজ তিনদিন ধরে বলচি - আবার তেজডা দেখলে তো ? – তোমার তেজ আমি …” গ্রাম বাংলায় ধানীচাষীরা ধান সংরক্ষণ করে রাখেন বাঁশের তৈরি ডোল বা ডুলিতে । প্রাচীন এই পদ্ধতিতে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক অঞ্চলে আজও বীজ ধান সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে । মূলতঃ ডোম উপজাতী কর্তৃক নির্মিত হয়ে থাকে বাঁশের এই বিশেষ বস্তুটি । আবার এসেছে কাসাই উপজাতীর প্রসঙ্গ, যাদের জাতীগত পেশা দস্তা-পিতল ইত্যাদির ঘটি-বাটি বিক্রি করা । সেই সঙ্গে পুরানো ঘটি-বাটির পরিবর্তে কোনও এক শর্তে নতুন ঘটি-বাটি প্রদান করা ।

‘বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর’ এই জনবহুল প্রচারিত আপ্ত প্রবাদ বাক্যটি সর্বজন গৃহীত। ব্যতিক্রম নয়, গ্রামীণ সমাজেও(যদিও গ্রামেই অধিকাংশ প্রবাদের প্রচলন)। দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা এমন কিছু ভ্রান্ত ধারণা লোক মুখে মুখে এমনভাবে প্রচারিত থাকে যা অবিশ্বাস করে এড়িয়ে চলা অনেক সুশিক্ষিত মানুষের পক্ষেও সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেখানে বিজ্ঞানের কাটছেঁড়া বিশ্লেষণ অথৈ জলে যায়। এই সমস্ত অজস্র লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গের অবতারনা হয়েছে ‘পথের পাঁচালী’তে । যার একটি দৃষ্টান্ত উপন্যাসের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে পাওয়া যায় – “সুদর্শন পোকা – ঠিক পোকা নয় – ঠাকুর। দেখিতে পাওয়া অনেক ভাগ্যের কাজ – তাহার মার মুখে, আরও অনেকের মুখে সে শুনিয়াছে । সে সন্তর্পণে ধুলার উপর বসিয়া পড়িল, পড়ে হাতে একবার কপালে ঠেকাইয়া আর একবার পোকার কাছে লইয়া গিয়া বারবার দ্রুতবেগে আবৃত্তি করিতে লাগিল –সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো...সুদর্শন সুভালাভালি রেখো (অবিকল এই রূপই সে অপরের মুখে বলিতে শুনিয়াছে ) । পরে সে নিজের কিছু কথা মন্ত্রের মধ্যে জুড়িয়া দিল – অপুকে ভালো রেখো, মাকে ভালো রেখো, বাবাকে ভালো রেখো, ওপাড়ার খুড়িমাকে ভালো রেখো – পড়ে একটু ভাবিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল – নীরেনবাবুকে ভালো রেখো, আমার বিয়ে যেন ওখানেই হয় সুদর্শন, রানুর দিদির মতো বাজি-বাজনা হয় ।’’

ধর্মের প্রতি মানুষের দুর্বলতা জন্মগত। সমাজ-সংস্কৃতিতে ধর্মের অস্তিত্ব অনিবার্য । আবার সাহিত্যে সমাজ অনিবার্য। সময় অনুসারে সাহিত্যিকের সৃজনে সমাজের নানা দিক প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। সমাজের দৈনন্দিন জীবনের কারুকার্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, ধর্ম ইত্যাদি সাহিত্যে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে চর্চিত হয়ে থাকে ।

আলোচিত ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রই ব্রাহ্মণ ; হিন্দু ধর্মালম্বী । তাঁদের অনেকের মধ্যেই ছিল লৌকিক দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস। ব্যক্তি বিভূতিভূষণ স্বয়ং নিজেও ছিলেন ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তাই তাঁর সমাজে পূজিত নানা দেব-দেবী উল্লেখিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, বিশালাক্ষী দেবী, বারোয়ারি ঠাকুর, সত্যনারায়ণ সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুর, শিব(গাজন/চরক) ইত্যাদি লৌকিক দেব-দেবীর নানা প্রাসঙ্গিক অবতারণা করা হয়েছে ‘পথের পাঁচালী’-তে। আর উল্লিখিত লৌকিক দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটিতে এসেছে বিভিন্ন লোক উৎসবের প্রসঙ্গ। যেমন – বারোয়ারি চরকপূজা, নীলপূজা, সত্যনারায়ণের পূজা, রাম নবমীর দোল ইত্যাদি লোকোৎসব। আয়ুর্বেদ বা কবিরাজি চিকিৎসা পদ্ধতির উপাদানের মূল উৎস বন-জঙ্গলের বিভিন্ন গাছপালা । এই চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পূর্ণই লৌকিক। যে পদ্ধতিকে লোক চিকিৎসা বলা যেতে পারে। এরকম একাধিক লোকৌষধের উল্লেখ এসেছে উপন্যাসটিতে। যার একটি দৃষ্টান্ত এরূপ – “রানুদের বাগান থেকে দুটো সাদা গন্ধ ভেদালির পাতা খুঁজে নিয়ে আয় তো – অপুর শরীরটা অসুখ করেচে, একটু ঝোল করে দোব । ...’’[ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ]

ব্রতকথা বা ব্রতচারণ লোকসাহিত্যের অন্যপ্রধান উপাদান । ব্রতের আভিধানিক অর্থ পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে বা কিছু কামনা করে পালিত ধর্ম-কর্ম । ব্রত মূলত নারীরাই পালন করে থাকে। সেখানে পুরুষের ভূমিকা নগন্য হলেও ‘কুলাই ঠাকুর ব্রতে’ র মতো কিছু আনুষ্ঠানিক ব্রতে তারাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে একাধিকবার ব্রত বিষয়ক অনুষ্ঠানের উল্লেখ এসেছে। যেমন – ‘কলুইচণ্ডী ব্রত’, মধুসংক্রান্তি ব্রত’, ‘সেঁজুতির ব্রত’, ‘সাবিত্রি ব্রত’, ইত্যাদি । শুধু তাই নয়, এই সব ব্রতকে কেন্দ্র করে এসেছে নিমন্ত্রন রীতি, আলপনা-চিত্র আঁকার প্রসঙ্গও । যেমন -

উদাহরণঃ ১) “মধু সংক্রান্তির ব্রতের পূর্বদিন সর্বজয়া ছেলেকে বলিল কাল তোদের মাস্টার মশায়ের নেমন্ত্রন করে আসিস – বলিস দুপুর বেলা এখানে খেতে ।’’[ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ]

উধাহরণঃ ১) “কেন এতদিন হয় নাই ? কেন এতকাল পরে ? সেই ছেলেবেলাকার দিনে জামতলায় সজনেতলায় ঘুরিবার সময় হইতে সেঁজুতির আলপনা আঁকা মন্ত্রের সঙ্গে এ সাধ যে তাহার মনে জড়াইয়া আছে, লক্ষ্মীর আলতাপরা পায়ের দাগ আঁকা আঙিনায় শ্বশুরবাড়ির ঘর-সংসার পাতাইবে । এরকম ভাঙ্গা পুরানো কোঠা বাঁশবন কে চাহিয়াছিল ?’’

‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে বাক্ কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিরও নানা উপাদান বর্তমান । উপন্যাসটির আদি-মধ্য-অন্ত্যে ছড়িয়ে আছে লোকসাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান – ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, মন্ত্র, রূপকথা, যাত্রা, লোকসংগীত ইত্যাদি বিষয়গুলি । ছড়া লোকসাহিত্যের প্রধান উপাদান । উপন্যাসটিতে ছড়া কখনও দুর্গার মুখে কখনও অপুর মুখে কখনও বা অন্য কোন প্রধান অথবা অপ্রধান চরিত্রের মুখে উচ্চারিত হয়েছে ।

উদাহরণঃ ১) “লাথি ঝাঁটা পায়ের তল

ভাত পাথরটা বুকের বল ।’’[ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ]

উদাহরণঃ ২) “আয়রে পাখি –ই-ই লেজ ঝোলা

আমার খোকনকে নিয়ে –এ এ গাছ তোলা ।’’[ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ]

উদাহরণঃ ৩) “বালু চরের বালুর চরে একটা কথা কই

মোষের পেটে মরুরছানা দেখে এলাম সই ।’’[ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ]

উদাহরণঃ ৪) “হলুদ বনে বনে

নাক চবিটিহারিয়ে গেলে সুখ নেইকো মনে ।’’[ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ]

লোকসাহিত্যের অপর একটি উপাদান মন্ত্র । ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে বৃষ্টি থামানোর মন্ত্র, আশীর্বাদের মন্ত্র, ব্রত পালনের মন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে ।

উদাহরণঃ ১) “পুণ্যি-পুকুর পুষ্পমালা কে পুজেরে দুপুর বেলা ?

আমি সতী লীলাবতী ভায়ের বোন ভাগবতী । ......”

[ ব্রত পালনের মন্ত্র,একাদশ পরিচ্ছেদ ]

উদাহরণঃ ২) “নেবুর পাতায় করমচা

হে বৃষ্টি ধরে যা......।’’[ বৃষ্টি থামানোর মন্ত্র, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ]

উদাহরণঃ ৩) “কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী

লোকার সন্তু নিরাময়া ......।’’ [ আশীর্বাদী মন্ত্র, ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ]

রূপকথার আভিধানিক অর্থ কল্পিত কাহিনি । একালের এক কবি লিখেছেন – “মনের মধ্যে পথ খুঁজে কতবার দিশে হারা / রূপকথার কোনো দেশ দেখিনি তো।’’ রূপকথা বা উপকথার কোনও দেশ থাকে না, থাকে না কোনও বাস্তবতা অথচ রূপকথার রস আস্বাদনে থাকে মধুর তৃপ্তি গ্রামবাংলাকে রূপকথার আকরভূমি বলা যেতে পারে। ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের অধিকাংশ পটভূমিই গ্রাম-বাংলার জনভূমি। উপন্যাসে কোনও রূপকথার কাহিনি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত না হলেও রূপকথা বা উপকথার প্রসঙ্গ একাধিকবার এসেছে। যেমন – কুচবরণ কন্যার কাহিনি, রাক্ষসীরাণীর কাহিনি ইত্যাদি।

গ্রাম বাংলার আনন্দ-বিনোদনের এক বড় ক্ষেত্র যাত্রা-ময়দান। বহু কাল আগের থেকেই যাত্রার আসর বসত। পুজা-পার্বণের উপলক্ষে আজও বঙ্গভুমির বিভিন্ন প্রান্তে যাত্রার আসর বসে থাকে। ‘পথের পাঁচালী’- তে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে যাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। “যদি পরশুরামের দর্প-সংহার হয় তবে আমি নিয়তি সাজবো, দেখো কেমন একটা গান আছে ...।’’ গান বা সংগীত লোকসাহিত্যের অপর একটি উপাদান। উপন্যাসটিতে কয়েকটি লোকগানের কলির উল্লেখ আছে – “কোথা ছেড়ে গেলি এ বন-কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথীরে।’’ কিম্বা “দিন-দুপুরে চাঁদের উদয় রাতা পোহানো হল ভার।’’

‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসটিতে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে। পথিক যেমন চলমান পথে প্রকৃতির নানা দৃশ্য দেখেন , তেমনি পথের পাঁচালী’র পাঠকও লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানের সঙ্গে পরিচিত হন। যে উপাদানগুলি একদিকে যেমন কাহিনির গতিদানে বিশেষ অবদান রেখেছে, অন্যদিকে চরিত্রগুলিকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে সহায়তা করেছে। যার দরুণ উপন্যাস সাহিত্যে ‘পথের পাঁচালী’ হয়ে উঠেছে অনন্যসাধারণ।

---------------------------------

গ্রন্থঋণঃ- ১) বাংলার লোক-সাহিত্য – আশুতোষ ভট্টাচার্য ।

২) বাংলা লোকসাহিত্য চর্যার ইতিহাস – বরুণকুমার চক্রবর্তী।

৩) গ্রাম্যসাহিত্য – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪) পথের পাঁচালী – বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ- অধ্যাপিকা ব্রততী চক্রবর্তী, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ।

**কালকূটের উপন্যাসে বাউল সঙ্গীত**

**শ্রীতম মজুমদার**

**গবেষক,বাংলা বিভাগ**

**কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়**

বাংলা সাহিত্যে লোক সংস্কৃতির প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। সাহিত্যে লোক সংস্কৃতি চর্চার দিকটিও বেশ শাখাপল্লবের মতো মুকুলিত হয়ে প্রসার লাভ করে উঠেছে। লোক সঙ্গীত লোক সংস্কৃতিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যা গানের আসরে এবং ক্যাসেট বাণিজ্য নির্ভর শিল্পে ক্রমবর্ধমান সমাদরতার পরিচয় দিচ্ছে। লোক সঙ্গীতের সামাজিক তাৎপর্য অন্বেষণে এবং সাহিত্য কীর্তি স্থাপনে আমরা সদা তৎপর। আর ‘বাউল গান’ সেইসব লোকসঙ্গীতের মধ্যে নিজ সৌন্দর্যে সমুজ্বল, স্বভাবতই জনপ্রিয়তার দিক থেকে বাংলার বাউল গানও সেই কীর্তি স্থাপনে ব্যতিক্রম নয়।

বাউল গান নির্ভর মানুষ। বাউলের ভাষায় যা ‘মনের মানুষ’ সে তো এক প্রকারে মানুষের অন্তরাত্মাই। ঈশ্বরীয় সত্ত্বা। দেহ আবরণের ভিতরের ঈশ্বরীয় সত্ত্বাই অচিন পাখির রূপ ধরে বসে রয়েছে। বাউল মানুষের কণ্ঠে গানের দোলা লাগলেই এলেই মনের ভাবটি প্রকাশিত হয়। বাউল গান সেই সম্প্রদায়ের ধর্মসাধনা বিষয়ে আলাদা কোন কেতাব নেই। গানেই সে সব তত্ত্ব এবং সাধন পদ্ধতি উল্লিখিত রয়েছে। সর্ব ধর্ম, বর্ণ-র গোঁজামিল তুলে দিয়ে মনুষ্যত্বের ধর্মকে প্রাধান্য দিতেই অবতারণা ‘মনের মানুষ’ থিওরির। রবীন্দ্রনাথও এই বাউল মানুষদের দেখেছিলেন খুব কাছ থেকে। সে কথার হদিশ মেলে তাঁর কবিতার পাতা ওলটালে-

‘কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে

একলা প্রভাতের রৌদ্রের সেই পদ্মানদীর ধারে,

সে নদীর নেই কোনো দ্বিধা

পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙ্গে ফেলতে।

দেখছি একতারা-হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে

মনের মানুষকে সন্ধান করবার

গভীর নির্জন পথে।

আমি ওদের দলে-

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন’।১

(পত্রপুট। কবিতা সংখ্যা ১৫।)

কবিতায় তাঁদের পথ চলার কাহিনি তুলে ধরে কবি এবার উপন্যাসেও সেই সুর বাঁধলেন।

১৯১০-এ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গোরা’ উপন্যাস শুরুই হয় বাউল গানের হাত ধরে-

*‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়,*

*ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়’। ২*

রবীন্দ্রনাথের বাউল প্রীতি আলোচনার পর এবার বাউলের উৎস সন্ধানে এগোনো যাক। বাউলের আবির্ভাব প্রধানত সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সময়ে। সময় বাড়ার তালে তালে ধীরে ধীরে তা প্রচার লাভ করে এবং জনমানসে প্রচারের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাউলের প্রতি, বাউল গানের প্রতি একটি আলাদা শ্রদ্ধাভাব বাড়তে থাকে। এই বাউলদের প্রসঙ্গে পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচায্য লিখেছেন, বাউল-

“a mad man. A class of beggars who pretend to be mad on account of religious fervor, and try to uphold their pretention by their fantastic dress, dirty habits, and queer philosophy of their songs.’৩

বাংলা সাহিত্যের গোড়ার দিকের সাহিত্য ফসল বা মধ্যযুগের অনবদ্য সৃষ্টিগুলির প্রতি চোখ রাখলে দেখা যাবে শ্রীকৃষ্ণবিজয়, চৈতন্যচরিতামৃত ও নানা রাগনির্ভর পদেও এই ‘বাউল’ শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বঙ্গবীনা’য় বলেছেন-*‘যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়ুবিক শক্তির সঞ্চার সাধন করিবার সাধনা করেন, তাহারা বাউল’।*

পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ রাঢ় অঞ্চলের (বীরভূম, বর্ধমান) বাউলকে অনেকে ‘ক্ষ্যাপা’ বা ‘খ্যাপা’ নামেও চিহ্নিত করে থাকেন। সমাজ জীবনের ঘেরাটোপের বাইরে বাউলদের অবস্থান, তাদের জীবনের মধ্যেও কোথাও যেন সংসারী মানুষ উঁকিঝুঁকি মারে। যে ধর্মতত্ত্বের মূল তত্ত্ব গোপনতা, তাকেই সর্বদা মেনে চলতে বাউলরা সদা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বংশ পরম্পরায় নয়, তাদের জীবন অতিবাহিত হয় গুরু পরম্পরায়। গুরুর মুখ থেকে শ্বাশ্বত বাণী প্রকাশ পায় শিষ্যের উদ্দেশ্যে, তাঁকে কানে কানে জানানো হয় গূঢ় কথা-

*‘আপন ভজন কথা*

*না কইবি যথা তথা*

*আপনাতে আপনি হইবে সাবধান’।*

গোপনীয় বস্তুর প্রতি প্রতি মানুষের আকর্ষণ দুর্নিবার। স্বভাবতইউ, বাউল সম্পর্কেও নানা কৌতূহল আমাদের মনের মধ্যে এসে ভিড় করে বাসা বাঁধে। মধ্যযুগের একটি কাব্যে ‘বাউল’ শব্দটি ব্যবহৃত দেখে অনেকে মনে করেন বাউল কি কোন ধর্ম? না কি একটা মৌলিক শব্দ। আসলে কেউ কেউ মনে করেন বাউল কথাটি ‘বাতুল’ থেকে এসেছে। বাতুল মানে পাগল। আবার কেউ কেউ মনে করছেন বাউল শব্দটি ‘ব্যাকুল’ শব্দ জাত। ব্যাকুল অর্থাৎ বাউলেরা আত্মনুসন্ধানে ব্যাকুল। বাউল গানের ভিতর সংকীর্ণতা ক্রমশ সরু হয়, সে সামাজিকভাবে ঘর বাতিল করে একেবারে শীর্ষে উঠে যাবতীয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর করে মনের আনন্দে।

বাউল বিশেষজ্ঞ অমিত গুপ্ত লক্ষ করেছেন-

*‘মূলত তত্ত্বভিত্তিক হলেও বাউল গানের.....সুর, ছন্দ, অর্থ, ও ব্যঞ্জনায় শুধু রস বিস্তারই নেই, অন্য আবেদনও আছে, বুদ্ধিজীবি এবং শ্রমজীবি সবার কাছেই বাউল গান গ্রহনীয়। বাউল গানের পটভূমি ক্ষেত্র ও পরিসর সমাজের পটভূমিতে তাই এত বিস্তৃত’।৪ (চক্রবর্তী, সুধীর)*

বাংলা ভাষায় এমন কোন লেখক নেই যাঁর রচনায় বাউল বিষয় হয়ে ওঠে নি। ‘বাউল’ তার নিজস্বতায়, এক পৃথক সাবেকীয়ানায় বিরাজমান। স্বভাবতই কালকূটের রচনাতেও ‘বাউল’ যে বিষয় হয়ে উঠবে সে কথা নিশ্চয় আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাউলজীবন, বাউলদর্শন, বাউলসঙ্গীত কিভাবে কালকূটের রচনায় স্থান পেল আর তা কতটা সার্থকভাবে সৃষ্টি হ’ল তা নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনার আয়াসসাধ্য কর্ম করা যথার্থ গবেষকের কাজ।

‘কালকূট’ ছদ্মনামে সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮ খ্রিঃ) দেশজ সংস্কৃতির ভিতর আবহমানকালের যে লঘুস্রোত বয়ে চলেছে তারই অন্বেষণে কালকূট ছুটে গেছেন রাঢ় বাংলায়। রবীন্দ্রনাথ তো রাঢ়ের মাটিতে থেকেছেন, সময় কাটিয়েছেন। আর কালকূট রাঢ়ের মাটিতে বাস না করলেও বারংবার ছুটে গেছেন বাউলদের দেখতে, মনের মানুষের অন্বেষণ করতে। সেখানে গিয়ে প্রত্যক্ষণ করেছেন আউল বাউল জীবনের ঘর ছেঁড়া মানুষ আর একতারার টুং-টাং ধ্ব্নি- এমনই একটি জগতে পৌঁছেছেন কালকূট। উদার হৃদয়ে দেখলেন বাউল জগতের বিশ্বপ্রেম ও সংকীর্নতাহীন একটি বাস্তবজীবনকে। যেখানে গানই হয়ে উঠল তাদের বাণী। ছেলেবেলা থেকেই ঘরপালানো, উদাসী ভাবটিই তাঁকে একেবারে বাউল সান্নিধ্যে এনে ফেলেছিল। বাউল মনের লেখক কালকূট। তিনি তাঁর সত্ত্বা সম্পর্কে অবশ্য বলেছেন-

*‘আমি সংসারের বেড়াজালের মধ্যে থেকেও পথের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারি না।‘৫*

(কালকূট বিশেষ সংখ্যা, কালকূট-এর বাস্তবতা ও বাস্তবের কালকূট, পৃষ্ঠা-৪০)

সেই পথের দাকে সাড়া দিয়েই কালকূট বেশ কিছু আউল-বাউল জীবনকেন্দ্রিক ও বাউল গান নির্ভর উপন্যাস লিখে গেছেন, যা ভূয়সী প্রশংসার বার্তা প্রেরণ করে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য যে তাঁর উপন্যাসের নামকরণেও বাউল গানের প্রয়োজনীয় শব্দবন্ধগুলি (আরশিনগর, ভোলামন, কোথায় পাব তারে, অচিনপাখি, মনের মানুষ প্রভৃতি) এসে ভিড় করে। যেমন, ‘খুঁজে ফিরি সেই মানুষে’, ’কোথায় পাব তারে’, ‘ঘরের কাছে আরশিনগর’, ‘পিঞ্জরে অচিন পাখি’, ’অমাবস্যায় চাঁদের উদয়’, ‘কোথায় সে জন আছে’, ‘হারায়ে সেই মানুষে’, প্রভৃতি।

‘খুঁজে ফিরি সেই মানুষে’(১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ) এটি কালকূটের একটি নাতি দীর্ঘ রচনা। ষাট সালের মার্চ মাসে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এই রচনাটি। জয়দেবের কেন্দুলি মেলাকে কেন্দ্র করে রচিত কালকূটের প্রথম বাউল বিষয়ক রচনা। ‘মানুষ খোঁজা’র মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মনের খিদে মেটাতে কালকূট পাড়ি দিলেন কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলি বা জয়দেবের মেলায়, পরিচিত হলেন বাউল সম্প্রদায়ের সাথে, মাটি ও মানুষের একাত্মতায়, স্পন্দনে, বাউলের গানে গানে, সহজ কথায় ও সুরে। সাধারণ মানুষের মনে আধ্যাত্মিক ভাবে জাগিয়ে তোলে। তাই তো বাউল গেয়ে ওঠে-

*‘ক্ষ্যাপা, না জেনে তর তোর আপন খবর*

*যাবি কোথায়?*

*আপন ঘর না বুঝে,*

*বাইরে খুঁজে*

*পড়বি ধাঁধায়।‘৬*

(কালকূট রচনা সমগ্র,প্রথম খণ্ড, খুঁজে ফিরি সেই মানুষে, পৃষ্ঠা ৩২৯)

বস্তুত বলা হয়েছে, শরীরটিই সব। সে ঠিক থাকলে সব ঠিক। শরীর ভালো রাখতে গেলে শরীরকে বুঝতে হবে, সেখানেই মনের মানুষের সন্ধান মিলবে। অর্থাৎ যে মানুষ নিজেকে চেনে। যে মানুষ নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ সেই মানুষেরই আত্মশুদ্ধি হয়। প্রাণের মানুষের দেখা মেলে কেবল তাঁরই। বাউলের সদা সঙ্গী গুগগুবি, ডুপকি, একতারা, খঞ্জনি, দতারা, বাঁয়া। আর এগুলি সব তাঁর নিজস্ব চলনের রূপরেখা। পার্থিব লোভ, লালসাকে দূরে রেখে কিভাবে সেই প্রাণের মানুষের সন্ধান করা যায় তাঁর উদ্দেশ্য বাউল গানে ধ্বনিত হয়েছে-

*‘ওরে খ্যাপা!*

*মন আছে তোর মনের ভিতর*

*তারে একবার ধাক না নেড়ে চেড়ে।‘৭*

(কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, খুঁজে ফিরি সেই মানুষে, পৃষ্ঠা ৩৩৩)

বাউলগানের ভিতর গুপ্ত তথ্য থাকে। সাঙ্কেতিকতার হাত ধরে তা চলতে থাকে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে- তবে বংশ পরম্পরায় নয়, গুরু পরম্পরায়। তাদের আয়ত্ত করা বিদ্যা তাই আড়াল রেখে গাইতে হয়।

*‘দেখবি সেথায়, জলের মধ্যে আগুন জ্বলে,*

*নিরালায় সে আছে বসে নীরে আর ক্ষীরে।*

*মন আছে তোর মনের ভিতরে’।৮*

(কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, খুঁজে ফিরি সেই মানুষে, পৃষ্ঠা ৩৩৩)

এখানে জলের মধ্যে আগুন জ্বলার তত্ত্ব বেশ রহস্যময়। তাই স্বভাবতই এখানে প্রয়োজন হয়ে পরে ব্যাখ্যার। আর সেই ব্যাখ্যার স্তরেও কালকূট দক্ষ হাতে নিজ নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের সাথে কিছুদিন থাকার সুবাদে তাদের খুব কাছের থেকে দেখেছিলেন, ফলে জেনেছিলেন তাদের প্রতি অত্যাচার, অবিচারের নেপথ্য কাহিনি। যে কারনে অনেকে এই পথ থেকে ভিন্ন পথে হাঁটা দিচ্ছেন। অস্তিত্ব সংগ্রামের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভেবে কালকূটের সামনেই এক বাউল গান ধরেছে-

*‘এক দেহন্তে হলি কানা*

*(তাতে) মানুষ জনম আটকাবে না।*

*মানুষ যদ্দিন থাকবে রে মন,*

*তারে সাধতে হবে মন মনা।‘৯*

(কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, খুঁজে ফিরি সেই মানুষে, পৃষ্ঠা ৩৩৩)

জীবন যখন আছে তখন মৃত্যু নামের বিপরীত শব্দটিও তার সাথে গা লাগিয়ে চলছে। আসলে,মৃত্যুই জীবনের বৃহৎ তথা চূড়ান্ত পরিণতি। তাদের অস্তিত্ব সঙ্কটকে বাউল গানের পরিভাষায় এক বাউল সেই চূড়ান্ত তথ্যে পরিণত করেছে।

জয়দেবের মেলায় নানা মাপের বাউলের ভিড়, তাদের কণ্ঠ থেকে ভেসে আসছে বাউলের সুর-বাউল গান। কোমর দুলিয়ে বাউল গাইছে গান, সেই গানের মধ্যেই আবার প্রশ্ন ছুঁড়ছে, আবার উত্তরও মিলছে সেই গানের কথাতেই। গানের মধ্যেই আবার ভেসে উতছে তত্ত্বকথা। সবশেষে রাধারানীর গাওয়া একটি গানই লেখকের হৃদয়ে শান্তি এনে দিয়েছে-

*‘আমার যেমন বেণী তেমনি রবে*

*চুল ভেজাব না’।*

কালকূটের স্বধর্ম হ’ল ‘মনের মানুষ’ খুঁজে নেওয়া। নানা রূপে ও নানা আঙ্গিকে বহু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে থাকলেও এক সময় সে তাঁকে ঠিক খুঁজে বের করবে। ‘কোথায় পাব তারে’ কালকূটের সবচেয়ে বাণিজ্যিক সফল এবং সার্থক বাউলতত্ত্বধর্মী উপন্যাস। এই উপন্যাসে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় চূড়ান্ত বাউল গায়কের টুকরো টুকরো ছবির কোলাজ ভেসে উঠেছে কালকূটের চোখে। বাউল সমাবেশে বাউলদের মাঝেই কালকূট যেন স্বয়ং এক বাউল চরিত্র রূপে বিরাজমান। কালকূটের অন্বেষণ বহুর মধ্যে একজনকেই খোঁজা। সেই প্রাণের মানুষ, আসল মানুষ, খাঁটি মানুষকে। উপন্যাসে কালকূটের মতো গাজী মামুদেরও প্রশ্ন-

*‘যার তরেতে মন ভুলেছে*

*আমারে বলবে কে সে কোথা আছে*

*তারে না দেখে যে হিয়া ফাটে*

*সদা মন তাপে জ্বলে যাই।*

*মনের মানুষ কথা পাই’।*

চারদিকের সীমাবদ্ধ সংসার যাত্রার যে পীড়ন তা থেকে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন, এক মুক্ত আকাশের খোঁজে। উর্ধ্বমুখী হয়ে হাত তুলে একতারা বাজিয়ে গেয়ে চলেছেন বাউল গান।

‘সব লোকে কয়, লালন কি সংসারে।

আমি কই, জেতের কী রূপ, দেখলাম না নজরে,

সুন্নত দিলে হয় মুসল্মান; নারীলকের কই হয় বিধান

বামন চিনি পৈ্তে প্রমাণ, বামনী চিনি কই ধরে’। ১০

(কালকূট রচনা সমগ্র, ২য় খণ্ড, কোথায় পাবো তারে পৃষ্ঠা ৫৯৬)

কালকূটের আলোচনায় বাউল ধর্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে এসেছে বাউল গানের গোপন তত্ত্বকথা, আর পথ চলতে চলতেই তিনি শুনলেন দেহতত্ত্বের গান-

‘কুলটা হইবি,

কুল না ছাড়িবি,

কলঙ্কে ভাসিবি নিতি,

পেয়ে কামরতি,

হয়ে অন্য পতি,

তাইতে বলবি সতী’।

বাউলের আখড়ায় গোপীদাসের সান্নিধ্যে এসে তিনি অবগত হন বাউল তত্ত্ব সম্পর্কে। পাঠককে তিনি নিয়ে যান এক আধ্যাত্মিক জগতে। বাউল তত্ত্বের মূল কথা হ’ল দেহ। এই দেহের অভ্যন্তরেই অবস্থান করে রয়েছে বাউলের দেবতা, তারা মানে না ঈশ্বর, মানে কেবল গুরু।

‘অমাবস্যায় চাঁদের উদয়’-বস্তুত বাউলতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এক উপন্যাস। লালন ফকিরের গানের কলিতে এখানে উক্ত তত্ত্বটির আভাস পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ যখন প্রকাশ পায় লেখক উপন্যাসের ভূমিকা অংশে লেখেন-

‘অমাবস্যায় চাঁদের উদয় মূলত একটি সাধন প্রক্রিয়া, যা প্রকৃতি পুরুষের মিলনজাত।.....এ কথাটি প্রধানত বাউলরাই তাঁদের গানে বলেছেন’।১১

(অমাবস্যায় চাঁদের উদয়, ভূমিকাংশ, কালকূট)

কালকূটের উপন্যাসে ব্যবহৃত বাউলগান রচনাগুলিতে এক ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে, আর সেই সাথে সাথে উপন্যাসের গতিকেও তরান্বিত করেছে। মামুদ গাজী, যোগমতী, ঝিনি, রাধা, সুজন, বলরাম, দীনবন্ধু, গোপীদাস প্রমুখ চরিত্রগুলির মুখে বাউলগান অনবদ্য শোভা লাভ করেছে।

*‘যে জন প্রেমের ভাব জানে না,*

*তাঁর সঙ্গে কিসের লেনাদেনা’।*

যারা এই গান গায় তারা নিভৃত স্বরে রটনা করে যায় মানুষের মধ্যে মানুষকে খুঁজে ফেরার ইতিকথা। এক্কেবারে বাংলার মাটি থেকে উঠে এসেছে বাউল গান। এই গান একান্তই এ বাংলার।

বাউলরা বাউল গান খায়, গান মাথায় দেয়। এ দেশের ধুলোমাটি কাদা জল দিয়ে মানুষের মনে দেহে গড়ে পিঠে বেড়ে উঠেছে বাউল বালাই। মনের ধ্বনিতে বেজে উঠছে বাউলগান। বাউলতত্ত্ব, বাউল দর্শন ও বাউল সাধনা এবং বাউল গান নিয়ে অনেক বইপত্তর ইদানিং বেরোচ্ছে, ভবিষ্যতে আরও বেরোবে। তবে কালকূট লিখিত এই সব পাঠ্যপুস্তকগুলি আকরগ্রন্থ বই কম নয়।বিষয়গুলিতে খুব সহজভাবে দর্শিত হয়েছে। বাউলগানের অপূর্ব সংযোজনায় কালকূট সাহিত্য জীবন্ত দলিল। অতঃপর কালকূট গান ধরেছেন-

*‘ইশারায় কইবি কথা*

*দেখিস যেন কেউ না শোনে।*

*কিছুদিন মনে মনে-*

*ও রাই, রাই লো!......’১২*

(কালকূট রচনা সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, কোথায় পাবো তারে, পৃষ্ঠা ১০৬২)

তথ্যসূত্রঃ

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. পত্রপুট কবিতা সংখ্যা ১৫, কোলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, ১৪১৭

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. গোরা, কোলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ, ১৪১৬

৩।চক্রবর্তী, সুধীর. ব্রাত্য লোকায়ত লালন, কোলকাতাঃ পুস্তক বিপণী, ২০০১,পৃষ্ঠা ১৪১

৪। চক্রবর্তী, সুধীর. বাউল ফকির কথা’ কোলকাতাঃলোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, ২০০১

৫। বসু, নবকুমার. সম্পাঃ বড়ুয়া সাধনা. কালকূট বিশেষ সংখ্যা, কালকূট-এর বাস্তবতা ও বাস্তবের কালকূট. কোলকাতাঃ গীতা প্রিন্টার্স,পৃষ্ঠা-৪০

৬। কালকূট. কালকূট রচনা সমগ্র. প্রথম খণ্ড, খুঁজে ফিরি সেই মানুষে. কোলকাতাঃমৌসুমি প্রকাশনী ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩২৯

৭। কালকূট. কালকূট রচনা সমগ্র. প্রথম খণ্ড, খুঁজে ফিরি সেই মানুষে. কোলকাতাঃমৌসুমি প্রকাশনী, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩৩৩

৮। কালকূট. কালকূট রচনা সমগ্র. প্রথম খণ্ড, খুঁজে ফিরি সেই মানুষে কোলকাতাঃমৌসুমি প্রকাশনী, ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩৩৩

৯। কালকূট. কালকূট রচনা সমগ্র. প্রথম খণ্ড, খুঁজে ফিরি সেই মানুষে. কোলকাতাঃমৌসুমি প্রকাশনী,২০০৮, পৃষ্ঠা ৩৩৩

১০। কালকূট. কালকূট রচনা সমগ্র. ২য় খণ্ড, কোথায় পাবো তারে. কোলকাতাঃমৌসুমি প্রকাশনী,২০০৯, পৃষ্ঠা ৫৯৬

১১। কালকূট. ভূমিকাংশ. অমাবস্যায় চাঁদের উদয়. কোলকাতাঃআনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ২

১২। কালকূট. কালকূট রচনা সমগ্র. তৃতীয় খণ্ড, কোথায় পাবো তারে. কোলকাতাঃমৌসুমি প্রকাশনী, ২০০৯,পৃষ্ঠা ১০৬২

**সহায়ক গ্রন্থঃ**

১। ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ. বাংলার বাউল ও বাউলগান. কোলকাতাঃওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৫৭

২। ঝা, শক্তিনাথ. বস্তুবাদী বাউল. কোলকাতাঃলোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৯

৩। চক্রবর্তী, সুধীর. বাউল ফকির কথা, কোলকাতাঃলোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৯৯

৪। চক্রবর্তী, সুধীর. বাংলা দেহতত্ত্বের গান. কোলকাতাঃপুস্তক বিপণি, ২০০০

৫। মুখোপাধ্যায়, আদিত্য. বাউল ও বীরভূম. বাঁকুড়াঃটেরাকোটা পাবলিশার্স, ২০০৫

৬। সম্পাঃ চাকী, লীনা. রবীন্দ্রনাথ ও বাউল.কোলকাতাঃপুস্তক বিপণি, ২০১১

৭। প্রামাণিক, সঞ্জয়. প্রসঙ্গ মধ্যজুগঃ বাউল গানের তত্ত্বকথা এবং ভাষা.কোলকাতাঃ অক্ষর প্রকাশনী,

প্রসঙ্গ ধর্মভাবনা : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দেবব্রত গায়েন

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

জনপ্রিয় সাহিত্যের পাশাপাশি সমান্তরাল সাহিত্যের পাশাপাশি যে ধারাটি নিরলস সাধনায় বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজের জীবনীশক্তিকে স্পন্দিত করে চলেছে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সেই ধারার এক কীর্তিমান লেখক, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় । সাহিত্য সমালোচকদের অবচেতনার কুসংস্কারই সম্ভবত সিরাজকে একজন ‘**মুসলিম লেখক**’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্য তো সাহিত্যই । বাংলা সাহিত্যকে কি হিন্দু সাহিত্য, ব্রাহ্ম সাহিত্য, মুসলিম সাহিত্য বা খ্রিস্টান সাহিত্য হিসেবে বিচার করা যায়? আমরা কি রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ দাশ-কে ব্রাহ্ম কবি, কাজী নজরুল ইসলামকে মুসলিম কবি কিংবা মাইকেল মধুসূদন দত্তকে খ্রিস্টান কবি? একই সাথে শঙ্খ ঘোষ কি হিন্দু কবি? শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হিন্দু সাহিত্যিক আর সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মুসলিম সাহিত্যিক? ব্যাপারটি অত্যন্ত হাস্যকর অলৌকিক হলেও, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের সাহিত্যপাঠক সমাজের অবচেতনায় এরকম বিচারধারা আজও ক্রিয়াশীল । এইপ্রেক্ষিতে ধর্মভাবনা সম্পর্কে স্বয়ং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নিজস্ব অভিমত এখানে স্মরণযোগ্য । যথা :

**১.** “জীনগ্রস্তের মতো একলা, জনহীন কোন স্থানে থুথু ফেলে মনে মনে বলি, ঘৃণা ধর্মকে-যা মানুষের মধ্যে অসংখ্য খাদ খুঁড়েছে । ঘৃণা ঘৃণা এবং ঘৃণা । …..ধর্ম মানুষকে হিন্দু অথবা মুসলমান করে । …..তার চোখে পরিয়ে দেয় ঘানির বলদের মতো ধুলি ।”

(লেখকের ব্যক্তিগত দিনলিপি)

**২.** ধর্ম নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনে । লেখা হিসেবে আমি চরিত্র বেছে নিই দরকার অনুযায়ী । হিন্দু মানুষ, মুসলমান মানুষ কিছু বুঝিনা । মানুষ বুঝি । এই দেশের মানুষ । তাদের ঘনিষ্ট ভাবেই চিনি । আমার কোনো শুচিবায়ু নেই । মানুষ শুধু আমার কাছে প্রকৃতির সন্তান ।

(লেখকের আত্মকথা)

**৩.** “ধর্ম ও সম্প্রদায় নিয়ে উপমাকে মাঝে মাঝে নানাবিধ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে । যাঁরা আমার সাহিত্যের নিষ্ঠাশীল পাঠক তাঁরা জানেন ধর্মের ব্যাপারে আমার মনে বিন্দুমাত্র গোঁড়া্মি নেই । হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ে আমি অসংখ্য লেখা লিখেছি, দুই সম্প্রদায়ের মানুষেরই নানাবিধ ঘরোয়া ও সামাজিক সমস্যা যা আমার শিল্পভাবনাকে আলোড়িত করেছে সেখানে আমি নিরপেক্ষ ও নিষ্ঠাশীল হতে চেয়েছি ।”

(লেখকের আত্মকথা)

**৪.** “আমার প্রচণ্ড মুশকিল হিন্দু-মুসলিম ব্যাপারটা । এমন অদ্ভুত কথা শুনতে হয়-কেন আমি হিন্দুদের কথা লিখি? হিন্দুদের কথা, মুসলিমদের কথা ইত্যাদি ব্যাপারটাও তাহলে সাহিত্যে আছে !”

(শান্তিনিকেতনের প্রদত্ত এক সভার ভাষণ)

**৫.** “বাংলা সাহিত্যে সর্বস্তরের সমাজজীবনেরই প্রতিফলণ ঘটেছে । সর্বোপরি, পাঠক, লেখকের কোনো জাতভেদ হয়না, নইলে ‘পথের পাঁচালী’ পড়তে গিয়ে আমি অনায়াসে অপু হয়ে উঠি কিভাবে?”

(দেশ, ২ রা মার্চ, ১৯৯১)

সদর্থে, ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে **‘সম্প্রীতি পুরস্কার’** প্রাপ্ত সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ এর পঞ্চমাত্রিক এই বক্তব্যের আলোকে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তিনি কোনো ভাবেই ‘মুসলিম লেখক’ ছিলেননা । তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কিত কথা বর্তমান । লেখকের রচনায় ধর্মীয় চরিত্র প্রকাশিত হয়না কখনই । যুগপৎ হিন্দু চরিত্রও তাঁর কলমে গভীর প্রাণ পায় । অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম যুগ্ম চরিত্রে, সহাবস্থানে তাঁর সাহিত্য পেয়ে যায় ভিন্নতর মাত্রা । সিরাজের সমস্ত রচনার বিস্তৃত পটভূমিতে হিন্দু-মুসলমান সব চরিত্রই এত বিশ্বস্তভাবে অঙ্কিত যে, দুই সমাজের পারম্পরিক সম্পর্কজাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ফেলে তা হয়ে উঠেছে বাঙ্গালি তথা ভারতীয় সমাজের এক পূর্ণাঙ্গ দলিল চিত্র । ধর্ম চিন্তার ব্যাপারে সিরাজের মানসিকতা দাঁড়িয়ে আছে হিন্দু-মুসলমান সমাজের দুই সংস্কৃতির সমভূমি ও মেলবন্ধনের উপর ভর করে । অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রান্তিক মানুষদের লোকনাট্যদল ‘আলকাপ’ পঞ্চাশের দশকে গ্রামবাংলায় ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় । এই লোকসংস্কৃতির গভীর অসাম্প্রদায়িক চেতনার মধ্যে দিয়ে সিরাজ দেখেছেন হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে এই সমাজের বাস্তব মানুষকে, দেশের মানুষকে । ধর্মীয় পরিচয় এখানে গৌণ । অতএব ধর্মীয় গোঁড়ামি মুক্ত হয়ে এই বুদ্ধিজীবী ঐতিহ্যের কাছে অঞ্জলি পেতে দাঁড়িয়েছেন ।

প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে দীপ প্রকাশন থেকে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘নানা রসের ছটি উপন্যাস’ নামে যে উপন্যাস সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর ভূমিকায় লেখক রাহুল দাশগুপ্তের মন্তব্য একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও বিস্ময় জাগায় –

“গত অর্ধ শতকে উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে মুসলিম লেখকরা বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম-অধ্যুষিত ভূখণ্ডের মতো পশ্চিমবঙ্গের উপন্যাসেও অসামান্য অবদান রেখেছেন । আবদুল জব্বার, আবুল বাশার, আওসার আমেদ, সোহারাব হসেন প্রমুখ নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় । তবে এই তালিকায় যাঁর স্থান সবার প্রথমে, তিনি হলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ । বঙ্গদেশের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় মুসলিম জনজীবনের আত্মপরিচয়ের অনাবিস্মৃত স্বরূপটিকে তিনি উন্মোচিত করতে চেয়েছেন এবং একাজ করেছেন অত্যাধুনিক আখ্যান-কৌশলের বহুমুখী প্রয়োগে ।”

প্রসঙ্গত কারণেই এরকম পঙক্তিগুলি পাঠকমহলে সাড়া জাগায় । উপরোক্ত লেখাটি পড়ে পাঠক সাধারণের মনে হবে, ২০১২ সালেও বাংলা সাহিত্যকে তাহলে এভাবে বিচার করা হয়! সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাহলে একজন ‘মুসলিম লেখক’? ‘মুসলিম জনজীবনের আত্মপরিচয়ের অনাবিস্কৃত স্বরূপটিকে’ উন্মচিত করাই ছিল লেখকের কাজ? আসলে সামগ্রিকভাবে বাঙালি জীবন সম্পর্কে পাঠক ও সমালোচকদের অবচেতনমনে ধর্মীয় সংস্কার একজন সাহিত্যিক ও তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রতি এভাবেই ভয়ংকর অবিচার করে ।

উক্ত সংকলনটিতে যে ছয়টি উপন্যাস আছে, সেগুলি হল-‘উত্তর জাহ্নবী’, ‘কিংবদন্তীর নায়ক’, ‘কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি’, অশরীরী ঝড়’, ‘নীলধরের নটী’, এবং ‘নিষিদ্ধ প্রান্তর’ । শুধুমাত্র শেষের উপন্যাসটি ছাড়া অই উপন্যাসগুলির সমস্ত মূল চরিত্রই তথাকথিত হিন্দু । শেষ উপন্যাস ‘নিষিদ্ধ প্রান্তর’-এর নায়িকা একজন মুসলিম মেয়ে, আঠারো বছরের রুবি । রুবির জীবন জড়িয়ে যায় হিন্দু-যুবক সুনন্দর সঙ্গে । উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর মনোভঙ্গিটি এরকম :

ক) “ধর্ম মানুষের শত্রুতা করতে পারে, ভীষণতম শত্রুতা । প্রেম-ভালবাসা যদি পাপ না হয়, তাহলে ধর্ম এখানে পরম শত্রু বৈকি ! অতএব ধর্মকে অস্বীকার করা ভালো ।”

খ) “হিন্দু মুসলমান আবার কি?স্রেফ মানুষ । যার সেই ধর্মটায় বিশ্বাস হবে, তাই নেবে । ওটা কোন সমস্যাই নয় । ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার ।”

সর্বোপরি যে যুবক-যুবতীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে উপন্যাসটি, ঘটনাচক্রে তারা কেউ হিন্দু বা কেউ মুসলিম পরিবারে জন্মেছে । কিন্ত এখানে ধর্মের উর্ধ্বে মানুষের মানবতা পুঁজি ও স্বাধীনতার বোধকে তুলে ধরা হয়েছে । একে কি কোনোভাবেই মুসলিম জনজীবনের আখ্যান বলা যায়? কোনোভাবেই বলা যাবেনা । এতদস্বত্তেও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে আখ্যা দেওয়া হবে ‘মুসলিম জীবনের’ কথাকার ?

বাংলা সাহিত্যের চিরসহায়ী সম্পদ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ধ্রুপদী উপন্যাস **‘অলীক মানুষ’** । উপন্যাসিক বিভিন্ন সমালোচক ‘মুসলিম জীবনের আখ্যান’ হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন । আসলে এই উপন্যাসের মূল দুটি চরিত্র বদিউজ্জামান এবং শফিউজ্জামান যেহেতু মুসলিম বংশোদ্ভূত এবং মুসলিম ধর্মগুরু বদিউজ্জামান জীবনকে ঘিরে উঠে এসেছে এক শ্রেণীর মুসলিম জীবনের নানা ঘটনাবলী, তাই উপন্যাসের এই দিকটিকেই বড় করে দেখেন ওইসব সমালোচক । উপন্যাসটি সম্পর্কে সিরাজের স্পষ্ট বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য । যথা :

“কোনও কোনও সমালোচক এই উপন্যাসটিকে মুসলিম জীবনভিত্তিক বলে পৃথক এক পঙক্তিভুক্ত করেছেন । কিন্তু আমি তো কোন মুসলিম জীবনভাষ্য রচনা করিনি । যে মিথিক্যাল ম্যানের কথা বলতে চেয়েছি – এই প্রেক্ষিতে তাদের মুসলমান-জীবন থেকে বেছে নেওয়া ছাড়া কোনও গত্যন্তর ছিলনা । কোনও হিন্দু চরিত্র দাঁড় করিয়ে তাকে বদিউজ্জাবনের ভূমিকায় বসানো যায় না ; তেমনি যায়না শফিউজ্জামানকেও। সে কারনে অনিবার্যভাবে এক একেশ্বরবাদী ধর্মগুরু, বাহ্মসমাজ এবং উনিশশতকের পরিপ্রেক্ষিত দরকার হয়েছিল। এ কথা সত্য, এই আখ্যানে হিন্দু-মুসলমান দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজটি উনিশশতকের শেষার্ধে সেই প্রথম কিভাবে রোপিত হয়েছিল তা দেখানোর চেষ্টা আছে। কিন্ত আমার লক্ষ্য ছিল, আবার বলছি, ‘মিথিক্যালম্যান’ । বাংলায় তাকেই আমি ‘অলীক মানুষ’ বলেছি।”

শুধুমাত্র মুসলিম জীবনের কাহিনী শোনানোতো লেখকের উদ্দেশ্য নয়। অন্যদিকে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সামগ্রিক সাহিত্য সৃষ্টির কথা ভাবলেও আমরা দেখি, সর্বত্রই প্রকৃতির অন্তর্গত মানুষের জীবন ও স্বাধীনতা বোধ সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। বঙ্গীয় জীবনের এহেন কথা শিল্পী কোনোদিনই নির্দিষ্ট কোন ধর্মের লেখক বলে পরিচিত নন, তিনি চিরটাকাল মানব-ধর্মের জয়গানে মুখরিত হয়েছেন। মুস্তাফা সিরাজ বিরচিত অসংখ্য উপন্যাস ও গল্প সংকলনে বাংলা সাহিত্য যে বিস্তর সমৃদ্ধ হয়েছে, দুটি সমান্তরাল সম্প্রদায়কে পৃষ্ঠাবদ্ধ করেছে – তাঁর শৈল্পিক ও সামাজিক মূল্য অত্যন্ত গভীর ।

পরিশেষে বলা যায় যে, যে কোন সৃষ্টিশীল সংস্কারমুক্ত উদারছেতা মানুষকে হাজার সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও তো এই যন্ত্রণা কম সহ্য করতে হয়নি। আপাতভাবে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-জীবন , হিন্দু-আধিপত্য অধিকলক্ষিত হলেও সার্বিক বিচারে বাংলা সাহিত্যকে যে ‘হিন্দুসাহিত্য’ অভিধায় চিহ্নিত করা যায়না- এ বিষয়ে পাঠক লেখকরা সকলেই একমত। লেখকের ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাস থাক্তেই পারে তাতে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের পাঠ গ্রহণে কোনো বাঁধা থাকেনা। প্রসঙ্গত এলিয়টের ক্যাথলিক বিশ্বাস, কাফকার ইহুদী বিশ্বাস এবং মার্কেজের খ্রিষ্টীয় ধর্ম বিশ্বাস তাদের সাহিত্য-উৎকর্ষতা বাড়িয়েছে বলেই সিরাজের ধারণা। সাম্প্রতিককালে আল মাহমুদ হজ করেছেন বা শামসুর রহমান নামাজ পড়েন – এসব যেমন তাঁদের কবিতা-পাঠের কোনো বাঁধা নয়, তেমনই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিষম নাস্তিকতা এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের প্রগাঢ় আস্তিকতা কিছুই সিরাজের কাছে ‘সামান্যতম অন্তরায়’ নয়। তিনি মনে করতেন, কালের বিচারেই সাহিত্যের প্রকৃত মূল্যায়ন ঘটে। তাই সাহিত্যসাধক সিরাজ নিজেই হয়ে উঠেছেন কালের কণ্ঠস্বর। সাহিত্য, সাহিত্যিককে এদেশে আজও ধর্ম-সম্প্রদায় সম্পর্কিত নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে দাঁড়াতে হয়। সিরাজকেও বারবার এরকম কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে মানুষ সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস ও আদর্শে চিরটাকাল অবিচল থেকেছেন তিনি। কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গণ্ডি তাঁর সাহিত্য ভাবনা ও জীবনবোধকে বেঁধে রাখত পারেনি। তাইতো তিনি স্বছন্দে পাঠ করেছেন বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতদ থেকে কোরান, বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ। তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন থেকে ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়েও। খুব কম বয়স থেকেই তাঁর এই পড়াশুনার বিস্তৃত পরিধি তাঁকে শিখিয়েছিল ধর্মের থেকে মানবতাবাদ অনেক বড়।

হাজার বছর ধরে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করলেও এবঙ্গের সাহিত্যে দেশের মানুষ হিসেবে মুসলমান সমাজের মানুষের প্রতিচ্ছবি দেখাই যায়না। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে কখনও কখনও যে মুসলমান চরিত্র এসেছে, তা-ও এসেছে আলাদা করে মুসলমান মানুষ হিসেবে। সামগ্রিকভাবে এই সমাজের মানুষ হিসেবে সেখানে কোন একাত্মতাবোধ লক্ষিত হয়না। সে অর্থে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজই বাংলার প্রথম কথা সাহিত্যিক যার সাহিত্যে অত্যন্ত সাবলীলভাবে উঠে এসেছে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মানুষেরা। অতএব একথা অনস্বীকার্য যে, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সর্বার্থেই একজন উদারচেতা মানুষ ছিলেন। হ্যাঁ, কথাশিল্পী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে যথার্থভাবেই একজন ‘ধর্ম নিরপেক্ষ মানুষ’ হিসেবে অস্বীকার করার উপায় কী?

**তথ্যসূত্র**

* লেখকের ব্যক্তিগত দিনলিপি-সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ।
* লেখকের আত্মকথা-সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ।
* নানারঙের ৬টি উপন্যাস-সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ।
* অলীক মানুষ-সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ।
* কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ।
* দেশ পত্রিকা ।
* ঐক্য পত্রিকা ।
* সমকালের জিয়নকাঠি ।
* একান্তর ।
* মনছবি ।
* উদার আকাশ ।

**রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : সার্ধশতবার্ষিক স্মরণ***তন্ময় মন্ডল গবেষক, বাংলা বিভাগ*

*কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়*

“ প্রিয়ানাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে

নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে”।

“প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি তোমাকে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।”১ বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের এমনি মানবিক আবেদন, এমনি অপার আহ্বান বারবার মনে করিয়ে দেয় বাংলা সাহিত্যের বিশেষ প্রতিভাবান রামেন্দ্রসুন্দরকে। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর আমি তোমাকে সাদরে অভিবাদন করিতেছি।”২ এ শুধু বিশ্বকবির বানী নয়, যেন বিশ্ব মানবের বানী। রবীন্দ্র সমসাময়িক প্রাবন্ধিকদের মধ্যে আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদি অন্যতম। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীর নিকটবর্তী টেঁয়া বৈদ্যপুরে রামেন্দ্রসুন্দর ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২০ আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গোবিন্দ কুমার ত্রিবেদি মাতা চন্দ্রকামিনী দেবী।

শৈশব কাল থেকেই তিনি লেখাপড়ায় কৃতিত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কখনো কোন পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান নয়, সর্বত্রই প্রথম স্থান পেয়েছেন। মাত্র ১১ বছর বয়সে ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করে সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। তিনি কান্দি রাজ হাই ইংলিশ স্কুল থেকে ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে মাসিক পঁচিশ টাকা ও ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ৪০ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এরপর ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে এম.এ.সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক এবং ১৮৮৮ তে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ৮০০০/- টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এম.এস.সি পাশ করে আইন নিয়ে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। কর্ম জীবনে তিনি রিপণ কলেজের অধ্যাপক ও পরে (১৮৯৩-১৯০৯) পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ছাত্রদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে তিনি মাতৃভাষায় বিজ্ঞান পড়াবার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। অশোক বাজপেয়ী মহাশয় অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন-

“অধ্যাপনার সময় তিনি কোনদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করিতেন না। তাঁহার চিরদিনের অভ্যাসমতো তিনি স্বমতে পড়াইবার একটা নির্দিষ্ট প্রণালী স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। পড়াইতে আরম্ভ করিলে, তাহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইত; ৫০ মিনিটে ঘন্টা, সময় পরিবর্তন সূচক ঘন্টা ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত না, কোন কোন দিন এক ঘন্টার স্থলে তিন ঘন্টাও পড়াইতেন।”

একদিকে বৈজ্ঞানিক মনন অপর দিকে দার্শনিক চিন্তাধারা আর এই দুইয়ের মাঝখানে সাহিত্যকে তিনি যেন সেঁতুর বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে দর্শেনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী, সাহিত্যের যমুনা’র ত্রিবেনী সঙ্গম লক্ষ্য করেছেন। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয়ে তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য সুসজ্জিত। তাঁর পূর্বে অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী দেবী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করলেও শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। তৎকালীন বাঙালি শিক্ষিত মননের যুক্তিশীল বৈজ্ঞানিক ভাবধারা তাঁর প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। বাস্তব জগতের সবকিছুকেই বিজ্ঞান ও দর্শেনর চোখ দিয়ে দেখেছেন। চিন্তার সামগ্রীকে তিনি সদা-সর্বদা উচ্চতর পর্যায়ে তুলে ধরেছেন। তাই বলা যায় বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি এক নবীন ধারার প্রচলন করে দিয়ে গেছেন। তাই তাঁর প্রয়াণ কালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থই বলেছেন- “আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যার একটা বড় জাহাজ ডুবিয়া গেল।”

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমুহ হল- ‘প্রকৃতি’(১৮৯৬), ‘পুন্ডরীক কুলকীত্তি পঞ্জিকা’(১৯০০), ‘জিঞ্জাসা’(১৯০৪), ‘বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা’(১৯০৬), ‘পদার্থবিদ্যা’, ‘মায়াপুরী’(১৯১১), ‘ঐতরেয় ব্রাহ্মন’(১৯১১), ‘চরিতকথা’(১৯১৩), ‘কর্মকথা’(১৯১৩), ‘বিচিত্র প্রসঙ্গ’(১৯১৪), ‘ভূগোল’, ‘শব্দকথা’(১৯১৭), ‘যজ্ঞকথা’(১৯২০), ‘বিচিত্র জগৎ’(১৯২০), ‘নানাকথা’(১৯২৪), ‘জগৎকথা’(১৯২৬)৩ ইত্যাদি।

তাঁর এই প্রবন্ধ গুলিকে সাধারণত চারটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে ----

**১) স্বদেশপ্রেমমুলক ---** স্বদেশের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের ভালোবাসা ছিল না একথা আমরা কখনই বলতে পারি না, কারণ স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলার স্ত্রী লোকদের উদ্বুদ্ধ করতে তিনি রচনা করেন ‘বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা’। তাঁর সহজ সরল চলিত ভাষাতেও অসামান্য দক্ষতা ছিল। মেয়েদের জন্য লেখা তাঁর এই প্রবন্ধটির ভাষাও ছিল নারীসুলভ – ‘লক্ষ্মী চঞ্চলা। চঞ্চল হয়ে বাঙলার লক্ষ্মী বাংলা ছেড়ে চললেন। আঁধার রাতে কালপেঁচা ডেকে উঠল্‌। রাজার দোষে লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে চল্‌লেন বলে রাজার দোষ দিয়ে সকলে কেঁদে উঠ্‌ল। ইংরেজ রাজা সেই কাঁদন শুনে বিরক্ত হলেন। ইংরেজ রাজার তখন একটা ছোকরা নায়েব ছিল; সে আপন দেশে ছিল কেরানী, হয়ে এসেছিল নায়েব। নায়েবি পেয়ে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করত। আলমগির বাদশার তক্তে বসে সে আপনাকে আলমগিরের নাতি ঠাওরাত। সে বললে, এরা বড় ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করছে; থাক এদের দু’দল করে দিচ্ছি; এক দিকে থাক মোছলমান, এক দিকে থাক হিন্দু। ............ এদের জোট ভেঙে দাও।’ **(‘বঙ্গদর্শন’, পৌষ-১৩১২) এই প্রবন্ধগ্রন্থটিতে রামেন্দ্রসুন্দরের সুগভীর স্বাদেশিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলমানের সৌর্হাদ্রপূর্ণ সম্পর্ক, গঙ্গার পবিত্র স্রোতধারায় স্নাত বঙ্গজননীর বন্দনা, এবং ইংরেজদের আগমন ও শোষণের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত এই গ্রন্থটির প্রধান বিষয়বস্তু।**

**২) ইতিহাস ও সমাজ ভাবনা মূলক ---** এই শ্রেনীর প্রবন্ধে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রসম্পর্কিত যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। ‘রাষ্ট্র ও নেশন’ (‘বঙ্গদর্শন’, ভাদ্র-১৩০৮) প্রবন্ধে তিনি নেশন নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করেছেন। ভারতে নেশন জন্মাতে না পারার কারণ হিসেবে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির বিচ্ছিন্নতাকে দায়ী করেছেন। ভারতে নেশ্নের অস্তিত্ব না থাকায় ভারত পরাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ‘বর্নাশ্রম ধর্ম’(‘বঙ্গদর্শন’, চৈত্র-১৩০৮), ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’(‘ভান্ডার’, শ্রাবন-১৩২২) এই সব প্রবন্ধ তাঁর ইতিহাস ও সমাজ ভাবনার সম্যক পরিচয় বহন করে।

**৩) শিক্ষা চিন্তা মূলক---** শিক্ষা চিন্তা মূলক প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য আদর্শের সমন্নয় ঘটিয়েছেন। স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার প্রতিদান স্বরুপ শিক্ষাকে তিনি যথার্থ গুরুত্ত্ব দিয়েছেন। ‘অরন্যে রোদন’(‘সাহিত্য’, আশ্বিন-১৩০৯) এই প্রবন্ধে তিনি ভারতবাসীকে ডাক দিয়েছেন যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য। ‘লোকশিক্ষা’(‘প্রবাসী’ বৈশাখ-১৩১৭) প্রবন্ধে লেখক লোক হিতার্থে শিক্ষার কথা বলেছেন। বলেছেন শিক্ষা প্রণালীর সংস্কারের কথাও। বাংলা কাব্য-কবিতা, পুরাণ, বৈদিক সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শব্দের পরিভাষাও নির্মাণ করেছেন। তিনি অনুভব করেছেন শিক্ষাই হল যথার্থ সাফল্য লাভের মূল পথ, আর এই পথের অনুসন্ধান দিতে গিয়ে সকল ভারতবাসীকে ডাক দিয়েছেন, মিলিত করতে চেয়েছেন একত্রে।

**৪) সাহিত্যমূলক--**- ‘নানাকথা’(‘বঙ্গদর্শন’, পৌষ-১৩০৯), ‘জিজ্ঞাসা’, ‘মহাকাব্যের লক্ষণ’ প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থ থেকে তাঁর সাহিত্য সমালোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। এই জগতের সৃষ্টি রহস্যের আড়ালে কী আছে? এমনি এক বিষয়কে নিয়ে মানুষের চিরন্তন কৌতূহল, আর এই কৌতূহলকে তিনি ‘জিজ্ঞাসা’ প্রবন্ধগ্রন্থে দর্শন ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। কীভাবে সৃষ্টি হয় মহাকাব্য? সুনিপুন শিল্প মহিমা ও যুক্তিশীল মননের আবেদনে এমনি এক প্রসঙ্গকে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর ‘মহাকাব্যের লক্ষণ প্রবন্ধে। শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে- “তাঁহার প্রবন্ধবলীর মধ্যে শুধু বিজ্ঞান ও দর্শনের কথা ছাড়া সাহিত্য চর্চা ও জীবন রসাস্বাদান প্রয়াসও আছে।” রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধের কেন্দ্রস্থলে সাহিত্যরস পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান, একথা স্বীকার করতেই হয়।

দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ত্রিবিধ মিলনে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ সৌন্দর্যতত্ত্বের আধার হয়ে উঠেছে। যুক্তিশীল মনন ও নিরপেক্ষ ভাবধারায় তাঁর প্রবন্ধগুলি হয়ে উঠেছে অনিন্দ্যসুন্দর। জটিল তত্ত্ব তিনি সহজ করে বোঝানোর জন্য উদাহরণের সাহায্য নিয়েছেন। সাধু ভাষায় তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন ঠিকই কিন্তু তা কখনোই বিরক্তিকর হয়ে ওঠেনি, হয়ে উঠেছে অনেকবেশি মননশীল। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও কোন সময়েই ভারাক্রান্ত মনে হয়নি। আবার কখনো কখনো তিনি জ্ঞানমূলক বিষয়কে রস মূলক করে তুলেছেন। অনেক সময় প্রবন্ধের রূঢ় কঠিনতাকে হাস্যরসের মাধ্যমে স্নিগ্ধ করে তুলেছেন।

জন্মের দেড়শত বছর পরেও সাহিত্যের মৌলভূমিতে রামেন্দ্রসুন্দর চির নবীন। “পূর্ব দিগন্তে তোমার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নব প্রভাতে উদ্‌বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।”৪ রবীন্দ্রনাথের এমনি অভিবাদন আজও আমাদের হৃদয়কে উদ্‌বেলিত করে তোলে। তাই আমরা একথা বলতেই পারি যে রামেন্দ্রসুন্দরের পরশে বাংলা সাহিত্য আজও নবপ্রাণে উদীয়মান।

তথ্যসূত্র---

১) ‘প্রবাসী’, ৫ ভাদ্র- ১৩২১

২) রবীন্দ্ররচনাবলী, অষ্টাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ-১৪১০, পৃষ্ঠা-৫৭

৩) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত, বাংলা সাহিত্যের সম্পুর্ন ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., ১৯৬৬, কলকাতা-৭০০ ০৭৩.

৪) রবীন্দ্ররচনাবলী, অষ্টাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ-১৪১০, পৃষ্ঠা-৫৮

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পঃ মানবিকতার মূল্যবোধ

তুষার কান্তি মণ্ডল

গবেষক ও শিক্ষক

কথা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র ছোটগল্প। ছোটগল্পের মাধ্যমে লেখকের প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা পদচারনা করেন, তাঁদেরও সাহিত্য প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়ন করা যায় তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের মাধ্যমে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বকীয় লেখনীর বিশিষ্টতায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে আলোকিত করেছেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে ।যদিও এর ঘনীভূত রূপ লক্ষ্য করা যায় ছোটগল্পে।

মানুষের জীবনের সার্থকতা কোনখানেসেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বিভিন্নযুগের মনীষীরা বিভিন্ন ভাবে, নিজেদের মত করে। তবে মানবজীবনের সার্থকতা যে তার মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হওয়া সে বিষয়ে কোন দ্বিধার অবকাশ নেই। কঠিন সমস্যা সংকুল বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে মানবজীবন তাঁর মনুষ্য ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। মানবিক নীতিবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে স্বার্থবুদ্ধি , ক্ষমতালোভী কিছুলোক সদম্ভে বিচরন করে । তবে মনুষ্যত্ব , সত্যধর্ম যে চিরন্তন এবং শ্রেয় পথ সে কথা চিরকাল ধরে বলে আসছেন সততায় ও মনুষ্যত্বে বিশ্বাসী ভাল মনুষেরা। শীর্ষেন্দু- র ছোটগল্পে ও জীবনের কঠিন বাস্তবতাবোধ জটিল সমস্যার কথা এসেছে যদি ও শেষ পর্যন্ত তার উত্তরণ ঘটেছে মানবধর্ম। সেখানেই দেখা গেছে মানবিক মূল্যবোধ ।

‘খবরের কাগজ’ গল্পে দেখা যায় ট্রন দুর্ঘটনা বা বিমান দুর্ঘটনার অদ্ভুদ কথা। বলা হয়, বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত হবে। হয়। হয়ে ও শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাতে লাভ হয় না । শুধু জানা যায় , হয় যান্ত্রিক গোলযোগে নয়তো কারো অসাবধনতার কারনে দুর্ঘটনা হয়েছিল । তাতে একটা মরা মানুষ ও বাঁচে না , একটা কাটা ঠ্যাং ও জোড়া লাগে না। তবে মৃতের আত্মীয়-জনেরা কেউ কেউ হয়তো ফাঁকতালে ক্ষতিপূরণ বাবাদ কিছু টাকা পেয়ে যায়। এমনই হয়েছিল গৌরির সাথে। গৌরি শ্যামাচরণের বড় মেয়ে। তার বিয়ে হয়েছিল সোমনাথের সাথে। সোমনাথ পুলিশেরা এ এস আই। কোন একদিন ট্রেনটি তার লাইন চ্যুত হয়। তাতে অনেক লোক মারা যায়। সেদিন হয়ত সোমনাথ ঐ ট্রেনটিতে ছিল। তবে তার লাশ পাওয়া যায় নি বলে শ্যাচরণ বিশ্বাস করতে চায় না। এদিকে গৌরি বাপের বাড়িতে এসে পড়ে আছে। মানুষের যা ধর্ম কোন একটা বিষয়ে নিশ্চিত হলে আগ্রহ হারিয়ে যায়। গৌরির ও তাই হয়েছিল। স্বামীর দীর্ঘদিন কোন খবর না পেয়ে সে পাড়ার একটি ছেলের সাথে মেলা মেশা শুরু করে দিল । কিন্তু মেয়ের অধঃপতন বাবা কিভাবে সহ্য করবে । তাই একদিন গৌরিকে নিজের কাছে ডাকল। খবরের কাগজ দিয়ে বলেছিল এখানে রোজ কত খবর বেড়য়। নিরুদ্দেশের খবর , নতুন খবর। এমন তো হতে পারে সোমনাথের খবর পাওয়া যাবে। বাবার এমন কথায় শান্ত হয়ে গেল গৌরি। তারপর থেকে দেখা গেল সকাল সন্ধ্যে সে খবরের কাগজে কি যেন খুঁজে চলছে।

‘সম্পর্ক’ গল্পের লাচ্চু আমেরিকায় গিয়েছিল জাহাজে চড়ে। তখন ওর বয়স কুড়ি। বিভিন্ন জায়গায় অর্থ সংস্থানের খোঁজে সে একদিন নিউ ইয়র্ক শহরে আসে। ঘুরতে ঘুরতে সে একদিন হোম ফর দি ডেস্টিটিউটস পেয়ে যায়। সে খুব খাটত। মাস খানেক পর ইতালিয়ন একটা দোকানে চাকরি হল তার। আমেরিকানরা জিনিস খারাপ হলে তাকে ফেলে দিয়ে নতুন করে কেনে। তা দেখে লাচ্চু হোম সার্বিস খোলার চেষ্টা করতে লাগল। কারন পড়াশোনা না জানলেও খারাপ জিনিস রিপিয়ারিং করা তার কাছে সহজ ব্যাপার। প্রচুর অর্থ করার পর সে বিয়ে করল কিন্তু তিন তিন বিয়ে করে যখন সে সুখী হল না তখন বিয়ে থেকে তার মন উঠে গেল। ভাবনা হল যে এত সম্পত্তি তার পর কে ভোগ করবে। কিছু দিন পর তার পুরান বন্ধুর সাথে দেখা হলে জানতে পারে তার বাবা, মা, ছোট বোন সবাই মারা গেছ। শুধুমাত্র তার বাবার দ্বিতীয় বারের বউ বেঁচে আছে । তার একটি মেয়ে এবং একটী ছেলে। ছোট বোনের বিয়ে দেওয়ার মত টাকা তার বাবার কাছে ছিল না বলে তার বাবা বিরাট টাকা পণ নিয়ে বিয়ে করে বোনকে বিয়ে দেয়। প্রথম বস্থায় লাচ্চুর রাগ হলেও একদিন তাদে দেখার জন্য সে ছদ্মবেশ নিয়ে তাদের কাছে যায়। সেখানে গিয়ে নানা সাহায্য করে। অবশেষে মহিলার প্রতি তার প্রেম জাগে তাকে বিয়ে করতে চায়। মহিলাও উপায় না পেয়ে রাজি হয়ে যায়। অবশেষে লক্ষ্য করে যে তার বাবার মৃত্যু দিবস ছোট ছেলেটা পালন করছে। এটা দেখে সে সম্বিত ফিরে পায়। যে বাবাকে সে ঘৃনা বশত তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে সে বিয়ে করার প্রস্তাব দিতে দ্বিধা বোধ করে নি । সেই পক্ষের ছেলে হয়ে বাবার খারাপ ব্যবহার পেয়ে ও সে বাবাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছে। এ চরম লজ্জার। তাই গোপনে পালিয়ে গিয়ে চিঠিতে ক্ষমা প্রার্থনা চেয়েছে সে। বলা যায় মানবিক মূল্যবোধ জেগে উঠেছে তার মধ্যে ।

‘ওষুধ’ গল্পে দুর্গাপদ এর একমাত্র মেয়ে লক্ষী । মেয়েকে বরাবরই একটু স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিল দুর্গাপদ। ভাবেনি শেষ বয়সে এসে তাকে এমন হয়রান হতে হবে। বিষয়টা এমন, লক্ষীরবিয়ে হয়েছে নবীনের সাথে । বিয়ের বছর পর সে বাপের বাড়ি এসে উঠেছে। বিয়ের আগে সে সারা পাড়াতে জ্বালিয়েছে , বিয়ের পর স্বামীকেও জ্বালিয়েছে এমন ধারনা তার বাবার। বিরক্ত হয়ে নবীন ডির্ভোস পেপার পাঠিয়েছে। এ ব্যাপারে লক্ষী উদাসীন। তবে শুধু সে নয় , উদাসীন তার মা ও । ডির্ভোস শব্দটার মানে তার এমন –

ইংরিজি জানে না, তবু উঠোনে নেমে এসে চিঠিখানা হাতে নিয়ে একটু ঠান্ডা চোখে চেয়ে রইল সেটার দিকে।

তারপর দুর্গাপদকে জিজ্ঞেস করল ডির্ভোস করবে নাকি?

তাই তো লিখেছে।

করলেই হল। আইন নেই?

ডির্ভোসের কথা তো আইনে আছে।

তোমার মাথা। ডির্ভোস হল বেআইনি ব্যাপার। কেউ ডির্ভোস করেছে জানতে পারলে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। জেল হয় ।

এই মা আর মেয়ে জন্য কারোর কাছে মুখ দেখাতে পারে না দুর্গাপদ । মনে মনে তার জামাই নবীনের কোন দোষ নেই। ডির্ভোস নিয়ে কথা উঠলে নবীন বলে তার উকিল বলে ডির্ভোস খুব শক্ত আর দুর্গাপদের উকিল বলে কোন কারণ দেখিয়েও ডির্ভোস ঠেকান যায় না।

লক্ষীর আর ভালো লাগে না। কতক্ষণ আর এমনি শুয়ে বসে কাটান যায়। একদিন কাউকে না জানিয়ে সে স্বামীর কাছে চলে যায়। আর এদিকে তার বাবা উপায় না পেয়ে জামাই এর কাছে ক্ষমা চেয়ে মেয়েকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবে । গল্পের শেষে দেখা যায় যে মেয়েকে পরম আদরে মানুষ করেছে সে । সে মেয়ে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে তার স্বামীর কাছে। নবীন বলে এভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত তা না হলে বিগড়ে যায়। মার খেয়েও একটা কথাও বলেনি লক্ষী বরং বাড়ির গিন্নির মত সেবা করেছে বাবাকে। শিক্ষার কথা উঠলে দুর্গাপদ বলে – সবার দ্বারা সব হয় না। নিয়তি কেন বাধ্যতে। এখানে যেন আমরা সেই মানবিক মুল্যবোধকে নতুন করে পাই।

শুধু মাত্র এ গল্পগুলি নয় । শীর্ষেন্দুর লেখা গল্পগুলি পড়লে দেখা যাবে অদ্ভুদ এক মনের পরিচয়। যে মন মানবিকতার পরিপন্থী। অর্থ, লোভ, লালসা,ঈর্ষা, প্রভৃতি মানুষকে পঙ্গু করে দেয় । আর যখন সেই মোহ ভাঙে তখন জন্ম হয় মানবিক মূল্যবোধের। তাই তোগৌরি, লাচ্চু, লক্ষীর মত চরিত্রগুলোকে প্রথমে স্বেচ্ছাচারী করে পড়ে শেষে পতন ঘটিয়ে আবার মানবিক মুল্যবোধ সম্পন্ন করে তোলেন লেখক। এটাই হয়ত লেখকের উদ্দেশ্য ।

**কাজী নজরুলের চোখে মুজফ্‌ফর আহম্‌দ**

**ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়**

**অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ**

**কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়**

কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফ্‌ফর আহম্‌দ-এর বন্ধুত্ব কারোর অজানা নয়। আমরা এও জানি নজরুলের অন্তর্গত বিদ্রোহের আগুনকে তিনি উস্কে দিয়েছিলেন। বাঁধভাঙা আবেগ-কে সংহত করে জনকল্যাণে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, তাও তিনি শিখিয়েছিলেন। যে-সাম্যবাদী ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল, যা তাঁর মানবতাবাদের আরেক প্রকাশ, তাকে কমিউনিস্ট ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত করেছিলেন মুজফ্‌ফর। তাঁরই কাছে নজরুল জেনেছিলেন রুশ বিপ্লবের কথা, লেনিনের ভূমিকা, সর্বহারার তত্ত্ব। শ্রমিক,কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষের জন্য নজরুল স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই লিখেছেন, পাশে থেকেছেন। তবে শৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তা-চেতনায় এনেছিলেন মুজফ্‌ফর। এজন্য তাঁর প্রতি কবির কৃতজ্ঞতা কম ছিল না। প্রায় অনালোচিত ও অনাদৃত একটি চিঠিতে নজরুল তাঁর বন্ধুপ্রীতি শ্রদ্ধা এবং আস্থার যে-পরিচয় দিয়েছেন সেখানে মুজফ্‌ফরকে আমরা অসামান্য মানূষ রূপে চিনতে পারি।

কবি নজরুলের সঙ্গে মুজফ্‌ফরের পত্রালাপ থাকলেও চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে। যোগাযোগ ঘটান কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। মুজফ্‌ফর আহম্‌দ তাঁর ‘কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা’ গ্রন্থে জানিয়েছেন, পল্টন থেকে সাতদিনের ছুটি নিয়ে কবি কলকাতায় এলে শৈলজানন্দ তাঁকে বত্রিশ নম্বর কলেজস্ট্রিট বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে নিয়ে আসে। মুজফ্‌ফর স্পষ্টই বলেছেন ‘এই সাতদিনের ছুটির সময়েই নজরুল ইসলামের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়’। কেমন সেই দেখা?

*হাঁ, কাজী নজরুল ইসলাম-কে সেদিন আমি প্রথম দেখলাম। সে তখন একুশ বছরের যৌবনদীপ্ত যুবক। সুগঠিত তার দেহ, আর অপরিমেয় তার স্বাস্থ্য। কথায় কথায় তার প্রাণখোলা হাসি। তাকে দেখলে, তার সঙ্গে কথা বললে যে-কোনও লোক তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারতো না।*

কলকাতায় স্থায়ীভাবে আসার পর নজরুল বন্ধুর সাহায্যে সাহিত্য-সমিতি ও অন্যান্য সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলির সঙ্গে ক্রমে পরিচিত হন। সেই সঙ্গে তাঁকে মুজফ্‌ফর রাজনীতিতে দীক্ষিত করেন। অন্তত বামফ্রন্টের প্রয়াত চেয়ারম্যান সরোজ মুখোপাধ্যায় এমনই দাবী করেছেন। বলেছেন, কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁকে রাজনীতিতে পুরোপুরি নিয়ে আসার চেষ্টা চালান (গণশক্তি / ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬)। দুজনে মিলে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ‘নবযুগ’ নামে সান্ধ্য দৈনিক সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন, যা জনপ্রিয় হয়েছিল।

কলকাতায় তালতলা লেনের বাড়িতে নজরুল ও মুজফ্‌ফর একসঙ্গে অনেকদিন ছিলেন। এরপর ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারিতে নজরুল কুমিল্লা চলে যান। এবং তাঁদের একসঙ্গে থাকা এরপর আর সম্ভব হয়নি। কিন্তু বন্ধুত্ব অটুট ছিল। নজরুল একাধিক সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করেছিলেন। সেখানে মুজফ্‌ফরের ভূমিকা লক্ষ করা যায়। সাপ্তাহিক ‘গণবাণী’ যখন ‘লাঙ্গল’ পত্রিকার পরিবর্তে প্রকাশিত হয় তখন কেউ কেউ তার সমালোচনা করেন। যেমন ‘তারারা’ ছদ্মনামে এক ভদ্রলোক বিরূপ সমালোচনা করলে নজরুল ‘আত্মশক্তি’ পত্রিকার সম্পাদক গোপাললাল সান্যাল-কে একতি চিঠি দেন। যে-চিঠিতে নজরুলের মেহনতী মানুষ সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও দরদ যেমন পাওয়া যায়, তেমনই মুজফ্‌ফর প্রসঙ্গে তার সুগভীর অনুরাগ ও সম্ভ্রম প্রকাশ পেয়েছে। ‘তারারা’ যখন জানতে চান, ‘গণবাণী’ পত্রিকা কি ভাতকাপড়ের সংস্থানহীনদের মুখপত্র? এই সাপ্তাহিকীতে সত্যিই কি তারা ঠাঁই পায়? এমন প্রশ্নের উত্তরে নজরুল জানান, ‘তারারা’ যদি একবার সরেজমিন তদন্তে আসেন তো দেখতে পাবেন তো দেখতে পাবেন : ‘বহু হতভাগ্যের পদধুলি ‘গণবাণী’ অফিসে স্তূপীকৃত হয়ে ‘গণবাণী’কেও ছাড়িয়ে উঠেছে। সে অফিসে মাদুরের চেয়ে মেঝেই বেশি...’। আরো বলেন, এখানে যেসব হতভাগ্যেরা আসে তারা ‘বাজ-পড়া, মাথা-নাড়া তালগাছের মতো’। তবে সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছেন মুজফ্‌ফর আহম্‌দ। যাঁর কথা লিখতে গিয়ে নজরুলের কলম আবগে, কান্নায় ভেসে গেছে। সুদীর্ঘ সেই চিঠির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

*... আমি হলফ করে বলতে পারি মুজফ্‌ফরকে দেখলে লোকের শুষ্ক চক্ষু ফেটেও জল আসবে; এমন সর্বত্যাগী আত্মভোলা মৌন কর্মী, এমন সুন্দর প্রাণ, এমন ধ্যানের দূরদৃষ্টি, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা – সবচেয়ে এমন উদার বিরাট বিপুল মন নিয়ে সে কি করে জন্মালো গোঁড়া মৌলবীর দেশ নোয়াখালীতে, এই মোল্লা-মৌলবীর দেশ বাংলায়, তা ভেবে পাইনে। ও যেন আগুনের শিখা, ওকে মেরে নিবৃত্ত করা যায় না। ও যেন পোকায় কাটা ফুল, পোকায় কাটছে তবু সুগন্ধ দিচ্ছে। আজ তাকে যক্ষ্মা খেয়ে ফেলেছে, আর কটা দিন সে বাঁচবে জানি না। ... মুজফ্‌ফরের মতো সমগ্রভাবে নেশন-কে ভালোবাসতে, ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে কোনও মুসলমান নেতা তো দূরের কথা হিন্দু নেতাকেও দেখিনি।*

তেরোশো তেত্রিশ বঙ্গাব্দের আটই ভাদ্র লেখা এই চিঠি নজরুল ও মুজফ্‌ফরের নিবিড় গভীর আন্তরিক সম্পর্ক ও বন্ধুপ্রীতির অতুলনীয় দৃষ্টান্ত বলে মনে করি।

বাংলা লোকনাটকে মেয়েরা

ড. সুমিতা চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

আদিম সমাজে নৃত্য এবং গান – এই ছিল মনের আবেগ প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে এলো সংলাপ। এলো নৃত্যের পরিবর্তে নতুন ধরণের শারীরিক অঙ্গভঙ্গি সংলাপ অভিব্যক্তির মাধ্যম হিসেবে। সৃষ্টি হল নাটক। প্রাচীন পরম্পরাকে কেন্দ্র করে সেই নাটক প্রবাহিত হয়ে চললো বাংলার জনসমাজ ও সংস্কৃতির ধমনীতে। লোকনাটকের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হোল। ‘লোক’ বলতে সাধারণত একধরণের গোষ্ঠীবদ্ধ মানব সম্প্রদায়কে বোঝায় যারা এক বশেষ সংস্কারে বিশ্বাসী। সে ‘লোক’ যে কোন ক্ষেত্রের হতে পারে। তবে বর্তমান শহর-সভ্যতায় এই ‘লোক’ শব্দটি অর্থ যথাযথ ভাবে প্রযোজ্য নয়। কারণ শহর-সভ্যতায় সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতা, একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ থাকা সম্ভব নয়। ‘লোক’ কথাটির যিথাযথ ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ তাঁর প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন –‘‘‘লোক’ শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়গত মানুষকে বোঝালেও বিশেষ অর্থে গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত বংশানুক্রমে এক বিশিষ্ট জনধারার বাহক গোষ্ঠীবদ্ধ মানবসম্প্রদায়কে বোঝানো হয়ে থাকে। ...সেজন্য লোক কথাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে পর্বত ও অরণ্যচারী এবং ভূমিচারী গোষ্ঠীবদ্ধ মানবসম্প্রদায়ের বিশ্বাস, সংস্কার, ক্রিয়া এবং আনন্দরসের শিল্পমাধ্যমগুলি। যথা, লোকবিশ্বাস, লৌকিক দেবদেবী, লোকশিল্প, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকনাট্য ইত্যাদি।’’ (প্রবন্ধ - যাত্রা : লোকনাট্য কি ? ; বাংলা গ্রামীণ লোকনাটক)

‘লোক’ দ্বারা অনুষ্ঠিত নাট্যক্রিয়াকেই লোকনাটক বলা হয়। এসম্পর্কে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন – “গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাট্যধর্মী রচনা মুখে মুখে প্রচারিত হয়, তাই লোকনাট্য।”(প্রবন্ধ – উত্তর বাংলার গ্রামীণ লোকনাট্য ; বাংলা গ্রামীণ লোকনাটক) নগরজীবনের সাংস্কৃতিক টানাপোড়েনের থেকে দূরে প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে প্রাত্যহিক জীবনের হাসি কান্না, ঠাট্টা রসিকতাই লোকনাট্যের প্রধান উপকরণ। কোথাও কোথাও নীতি উপদেশ থাকলেও সেখানে কোন গভীর তত্ত্বকথা উঠে আসে না। সমগ্র বঙ্গ প্রদেশে এমন বহু নাটক প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত রয়েছে। গম্ভীরা, আলকাপ, কুশান, চোর-চুরণী, খনের গান, পালাটিয়া, রঙ পাঁচাল, বোলান, কালীকাচ, ডোমনি, লোটো, ভাঁড় যাত্রা প্রভৃতি বহু নাটক বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আজও সমান ভাবে অস্তিত্বে রয়েছে এবং প্রত্যেকেই তার স্ববৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তবে অনেক সমালোচকই এর মধ্যেকার সব পালাকে যথার্থ লোকনাটক বলে মেনে নেন না। যথার্থতার সেই তর্কে না গিয়ে সাধারণভাবে একথা বলা যেতেই পারে যে যেহেতু উল্লিখিত পালাগুলির মধ্যে নাট্যগুণ যথাযথ রূপে বর্তমান, সেকারণে আলোচ্য বিষয়ের ভিত্তিতে এগুলিকে লোকনাটকের পর্যায়ে রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

বাংলা লোকনাটকে মেয়েদের অবস্থান এই নাট্যসৃষ্টির প্রথম যুগ থেকেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই নাটকগুলির কাহিনি। যদিও মেয়েরা এর অভিনয় থেকে এবং দর্শকমণ্ডলী থেকে দূরে ছিল। তবে সেখানে ঘটনা আবর্তিত হয়েছে মেয়েদেরকে ঘিরেই। পুরুষ কেবল মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করেছে। পরবর্তীকালে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে লোকনাটকে মেয়েরা স্থান করে নিয়েছে নিজেদের ভূমিকা অভিনয়ে। সামাজিক ও আর্থিক স্বাধীনতার ইচ্ছে হয়তো এর একটা বড় কারণ হতে পারে। লোকনাটকের দলগুলিও এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থের বিনিময়ে অভিনয় করে থাকে। তাই দামী লোকনাটকের দলে এখন মেয়েদের ভূমিকায় মেয়েদেরই অভিনয় করতে দেখা যায়। দর্শকমণ্ডলীতেও এখন মেয়েদের অভাব নাই। আবার কোন কোন পালা প্রাচীন কাল থেকে কেবলমাত্র মেয়েদের দ্বারাই অভিনীত হয়ে চলেছে। সেখানে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এদিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে বর্তমান আলোচনাকে দুই ভাগে বিভাজিত করা যেতে পারে – এক : মহিলাকেন্দ্রিক লোকনাটক; দুই : মহিলা দ্বারা অভিনীত বা সঞ্চালিত লোকনাটক।

কোচবিহারের লোকনাটকের ধারায় ‘**কুশানপালা’** অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে। সাধারণ গ্রাম্য জীবন-ভিত্তিক কাহিনিকে কেন্দ্র করে আবর্তীত হয় এই লোকনাটক। রূপধন কন্যা, গুঞ্জরা বিবি, দুবুলাবালি, সতী বেহুলা ইত্যাদি নামকণ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে এগুলি মহিলা কেন্দ্রিক লোকনাটক। এই নাটকে মহিলার বেশে যে সকল পুরুষেরা অভিনয় করেন তাঁদের বলা হয় ‘ছোকরা’। ছোকরাদের নাচ নাটকের এক অভিন্ন অঙ্গ। রাজবংশী সমাজে বিয়ের আগে এই নাট্যের আসর বসানো হয়। বিষহরা বা বিষহরী এর সবচেয়ে জনপ্রিয় পালা। মা পদ্মার উক্তি দিয়ে নাটকের প্রারম্ভ এবং বেহুলার স্বামী হারানোর দুঃখই তার মূল বিষয়বস্তু। বর্তমানে ছোকরাদের স্থানে বহু মেয়েরা এই পালায় অভিনয় করেন। এজন্য তাঁরা পারিশ্রমিকও নিয়ে থাকেন।

শিববন্দনাকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের আর একটি প্রধান লোকনাটক ‘গম্ভীরা’। তবে এর সমগ্র নাট্যকাহিনি আবর্তীত হয় সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। গম্ভীরা পালায় নারী কেন্দ্রিক কাহিনি অপরিহার্য অঙ্গ হলেও সেখানে আজও মহিলা শিল্পীর প্রবেশ ঘটেনি। ‘ডুয়েট’ বা ‘চার-ইয়ারী’ অংশে পুরুষেরাই মহিলার বেশে অভিনয় করেন। বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের লোকনাট্যের ধারায় ‘লোটো’ এককালে বহুল প্রচলিত থাকলেও এখন এই লোকনাট্যের প্রচলন অনেক কম। হিন্দু মুস্‌লিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই লোটো পালা বর্তমান। বিশেষত হিন্দু মেয়েরা পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে এবং মুস্‌লিম মেয়েরা বিয়ের আসরে এই লোটো পালার গান করেন। প্রাচীন কালে সন্ধ্যাবেলা নট-নটীরা হাস্যরসাত্মক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটক অভিনয় করত। সাধারণ প্রজা ও রাজপুরুষেরা তা উপভোগ করত। তবে সেখানে যুবকেরাই নটীর বেশ ধারণ করত। এই যুবকদের বলা হত সখী, বাঈ, ছোকরা বা বেঙাচি। কিন্তু এখন এই স্থান অনেকখানিই মেয়েদের দখলে। পাঁচের দশকের শেষের দিকে বর্ধমান জেলার রায়না থানার উচালন গ্রামে শেখ কাজেম আলীর লোটোর দলে গ্রামের আদিবাসী সাঁওতাল মেয়ে লক্ষ্মী মাণ্ডী যোগ দেন। একারণে সাঁওতাল সমাজে তাঁকে অনেক নির্যাতনও ভোগ করতে হয়েছিলো। কিন্তু তাঁর অভিনয়ের জন্য এই দলের খ্যাতি সমগ্র বঙ্গ প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাঁর থেকে প্রভাবিত হয়ে বর্তমানে বহু অভিনেত্রী এই নাট্যধারায় যোগ দেন। হিন্দু সমাজের তপশীলভুক্ত মেয়েরা ও নিম্ন শ্রেণির মুস্‌লিম মেয়েরা এখন এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করছেন। এঁরা সমাজ-স্বীকৃত হয়ত হতে পারেননি বা যথার্থ সামাজিক মর্যাদা হয়ত পাননি তবু তাঁদের আর্থিক স্বাবলম্বনবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।

‘ভাঁড়যাত্রা’ বর্তমানে প্রায় নিশ্চিহ্ন হলেও এককালে সমগ্র বাংলায় এর বহুল জনপ্রিয়তা ছিল। এই নাটকে ভাঁড় অর্থাৎ হাস্যরসিক বা বিদূষক চরিত্র দৃশ্যশেষে তাঁর সঙ্গিনীকে নিয়ে এসে দর্শকদের কিছু সময় হাসিয়ে যান। মুস্‌লিম জনবহুল অঞ্চলে এর প্রাধান্য থাকায় এর বেশিরভাগ অভিনেতাই মুসলমান। এই নাটকেও প্রথমে পুরুষেরা মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করত। পরে মেয়েরা এলেন নারী চরিত্রের অভিনয়ে। এই মেয়েদের জন্য ভাঁড়যাত্রা খ্যাতি পেলেও এই মেয়েদের সামাজিক কোন মর্যাদা আজও নেই বললেই চলে। এঁদের পতিতালয় থেকে আনা হয়। তাই অভিজাত মানুষজন এই ভাঁড়যাত্রা থেকে প্রায় দূরেই থাকে। এছাড়া দর্শকের স্থানেও মেয়েদের অভাব দেখা যায়। সামাজিক স্বীকৃতির অভাব থাকলেও যে সকল মেয়েরা ভাঁড়যাত্রাকে জনপ্রিয়তা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মেদিনীপুরের স্কুল বাজারের গৌরী, মোহিনী; তমলুকের সুবলা, পারুল, রাধিকা, কমলা, কাঞ্চনমালা; মেছেদার লীলাবতী ও তাঁর মেয়ে গোলাপি। লীলাবতী ও গোলাপি তাঁদের নেতৃত্বে মেয়েদের নিয়ে নিজস্ব ভাঁড়যাত্রার দলও গঠন করেছিলেন।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত বাংলায় প্রচলিত ‘ডোমনি’ নাটক কেবলমাত্র ভাষাগত দুর্বোধ্যতার জন্য বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। এর ভাষা ভাঙা মাগধী বা খোট্টাই। নারী এই নাটকের কেন্দ্রবিন্দু। এই নাটক কেবলমাত্র মহিলাকেন্দ্রিকই নয়, প্রাচীন কাল থেকে মহিলা দ্বারা অভিনীতও। অনেকের মতে ডোম জাতির মেয়েদের দ্বারা অভিনীত বলে এই পালাকে ডোমনি বলা হয়ে থাকে। মালদহ জেলার কারম উৎসব উপলক্ষে মেয়েরা এই পালা অভিনয় করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নগদ টাকা এবং ফসল সংগ্রহ করেন। ডোমনির মত আর একটি লোকনাট্য ‘ডোমকাচ’। এই নাটকেও পুরুষের কোন ভূমিকা নাই। এমনকি দর্শকের স্থানেও পুরুষের বসবার কোন অধিকার নাই। এই নাটক সম্পূর্ণ ভাবে মহিলাদের দ্বারা এবং মহিলাদের জন্য অভিনীত হয়। পুরুষ চরিত্র থাকলেও সেখানে মেয়েরাই পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এর কোন লিখিত পালা থাকে না। ছেলের বিবাহের বরযাত্রী রওনা হবার পর মেয়েরা ঘরে ডোমকাচ-এর অভিনয় করেন। হাস্যরসই এর প্রধান উপাদান।

‘আলকাপ’ মুর্শিদাবাদ পার্শবর্তী ক্ষেত্রের এক জনপ্রিয় লোকনাট্য। গম্ভীরা পালা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলকাপের সৃষ্টি। অনেকে মনে করেন আলকাপের স্রষ্টা হলেন বোনাকানা বা বনমালী প্রামাণিক। উৎসব-অনুষ্ঠান নিরপেক্ষ এই লোকনাট্যে ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজের নানান অসঙ্গতিকে তুলে ধরা হয়। আলকাপে নারীবেশী পুরুষ অভিনেতাদের বলা হয় ছোকরা বা নাচিয়া। খেমটা নাচ অংশে এই নারীবেশী পুরুষেরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই সকল পুরুষেরা মেয়েদের অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করেন এবং মেয়েদের কণ্ঠস্বরে কথাও বলেন। এদের বলা হয় খেমটি। তাই নির্দিষ্ট বয়সের পর তাঁরা আর ছোকরার ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন না। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ভাষায় – “কম বারো উপরে বিশ / তাতে একটু উনিশ বিশ।” বর্তমানে কিছু কিছু আলকাপের দলে মেয়েরা অভিনয় করছে।

বাংলায় লোকনাটক সৃষ্টির আদি কাল থেকেই মেয়েদের স্থান সেখানে সুস্পষ্ট। উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত বাংলায় মেয়েদের লোকসমক্ষে আসা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু নাটকের বিষয় হিসেবে মেয়েদের কথাকে তুলে ধরবার প্রবণতা নাট্যসৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্ব থেকেই চলে আসছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাহিনি আবর্তীত হয়েছে মেয়েদের কেন্দ্র করে। পুরুষ সেখানে নারীর বেশে তাঁদের স্থানে অভিনয় করেছেন। অথচ শতাব্দীকাল আগে পর্যন্ত মেয়েরা শুধুমাত্র এর অভিনয় থেকেই নয়, দর্শকের স্থান থেকেও বঞ্চিত ছিল। উনিশ শতক থেকেই মেয়েদের ঘিরে যে প্রাচীন সমাজ-মানসিকতা চলে আসছিলো তাতে ভাঙন দেখা দিলো। বিদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি অন্তঃপুরের মেয়েদেরকেও প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে যে প্রভাবিত করেছিল সেকথা অস্বীকার করা যায় না। মেয়েরা ধীরে ধীরে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে থাকেন। শহর থেকে দূর গ্রামেও এই নবজাগরণের প্রভাব পড়ে। এবার মেয়েরা খোলা মঞ্চে পুরুষের পাশে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ফলে সমাজ একদিকে যেমন তাঁদের অভিনন্দন জানালো তেমনই রক্ষণশীল সমাজ থেকে উঠে এলো প্রবল বিরোধ। আজও সেই অভিনন্দন ও বিরোধের পালা থামেনি। মেয়েরা এখনও সংঘর্ষরত লোকনাট্যের মঞ্চে এবং সমাজে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে।

বাংলা নাটকে সাংলাপের বির্বতন

আশিস রায়

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা নাটকের সূচনা পর্বে ছিল সংস্কৃত নাট্য সংলাপের অন্ধ অনুকরণ। সেই সঙ্গে যুক্ত হল যাত্রাপালার সংলাপ। নাট্য সংলাপ সম্পর্কে শিল্প সচেতনতার প্রথম পরিচয় দিয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। নাট্য জগতে মাইকেল এর আগমনের পূর্বে যে সকল নাটক মুদ্রিত ও অভিনীত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারাচরন শিকদারের ‘ভদ্রার্জুন’ (১৮৫২), নন্দকুমার রায়ের ‘আভিজ্ঞান শকুন্তলা’ (১৮৫৫/আভিনয় ৩০ জানুয়ারী ১৮৫৭), উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবাবিবাহ’ (১৮৫৬/আভিনয় ২৩ এপ্রিল ১১৮৫৯, মেট্রপলিটন থিয়েটর) প্রভৃতি। এর একমাত্র ব্যাতিক্রম ছিল যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ‘কীর্তিবিলাস’ (১৮৫২) পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত, কিন্তু নান্দী ও সূত্রধর এ নাটকে আছে। মধুসূদনই প্রথম বাঙালি নাট্যকার যিনি সচেতন ভাবে প্রাচ্য ধারার নাট্য প্রকরণ এড়িয়ে নাটক লিখেছেন। ‘শর্মিষ্ঠা’ সম্পূর্ণ সংস্কৃত নাট্য ধারার প্রভাব মুক্ত এ কথা বলা যায় না, কেননা তিনি অনেক কিছু বাদ দিয়েছিলেন ঠিক, তবে আবার অনেক কিছু গ্রহণ ও করেছিলেন। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে যে নাট্য ধারার প্রচলন ছিল তা থেকে বেরিয়ে আসার কোন উপায় ছিল না মধুসূদনের। পাইকপাড়ার রাজভ্রাতারা বহু অর্থব্যয়ে যে মঞ্চ তৈরি করেছিলেন সেই মঞ্চের উপযোগী নাটক লিখতে হয়েছিল মধুসূদনকে। তাই বেলগাছিয়া মঞ্চ ও রাজনারায়ণের ‘রত্নাবলী’র পথ সম্পূর্ণ বর্জনের উপায় ছিল না মধুসূদনের। এক মঞ্চ, এক অভিনেত্রী, এক প্রয়োজনীয়তা। এ সব কিছুর বাইরে যাবার সাধ্য ছিল না মধুসূদনের। শর্মিষ্ঠা নাটকে যযাতি বিদূষক সেনাপতি, বকাসুর ও দেবযানীর ভুমিকায় যারা ছিলেন তারাই রত্নাবলী নাটকে অনুরূপ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। একই অভিনেতা গোষ্ঠী, মঞ্চ ও প্রযোজনা নাট্যকারের স্বাধীনতা বেশ কিছুটা খর্ব করেছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু, মধুসূদনের জীবন চরিতে এ বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন । দুটি নাটকেই ভাবগত সাদৃশ্য আছে অনেক।

অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে মধুসূদন ইংরেজিতে কতকগুলি চিঠি লিখেছিলেন। সংস্কৃত নাটকের প্রতি তার বিরাগ ও পাশ্চাত্য নাটকের প্রতি তার অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন। সংস্কৃত নাটকের সংলাপের প্রতি তার বিরাগের কারণ সংস্কৃত নাটকে চরিত্রের মুখে যে সংলাপ বসান হয় তা চরিত্রের ভিতর থেকে আসে না। অনেকটা যেন জোর করে তাদের মুখে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণকুমারী প্রসঙ্গে মধুসূদন কেশবচন্দ্রকে লিখেছিলেন ,-\_

I shall endeavour to create characterswho speak as nature suggests and not mouth mere poetry.

মধুসূদন এমন চরিত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যারা স্বাভাবিক ভাবে কথা বলবেন, কারোর বলে দেওয়া কথা সে আওড়াবে না। তিনি জানতেন সংলাপ নাটকের প্রাণ তাকে আশ্রয় করে নাটকের চরিত্র সৃষ্টি হয়। তাই সংলাপ হবে স্বাভাবিক, গতিশীল, সংক্ষিপ্ত এবং চরিত্রের উপযোগী। তবুও তিনি এই নিয়ম ধরে রাখতে পারেননি শর্মিষ্ঠার ক্ষেত্রে। দীর্ঘ, কৃত্রিম, বর্ণনামূলক সংলাপ শর্মিষ্ঠা নাটকে ব্যবহার করেছেন। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেবযানী তার পূর্বরাগের কথা সখী পূর্ণিকার কাছে প্রকাশ করেছেন তা অতি দীর্ঘ। তৃতীয় অংকে যযাতি ও শর্মিষ্ঠার প্রণয় সংলাপ অলংকারে পূর্ণ ।

যযাতি।। সুন্দরি, আমাদের ক্ষত্রিয়কুলে গান্ধর্ববিবাহ প্রচলিত আছে, আর তুমি রূপে ও গুণে সর্বপ্রকারেই আমার অনুরূপ পাত্রী, অতএব হে কল্যাণী, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার পাণিগ্রহণ কর ।

শর্মিষ্ঠা ।। (স্বগত) হা হৃদয়, তোর মনোরথ এতদিনের পর কি সফল হবে? (প্রকাশে) হে নরনাথ! আপনি এ দাসীকে ক্ষমা করুন! আমার প্রতি এ বাক্য বিড়ম্বনা মাত্র ।

যযাতি ।। প্রিয়ে, আমি সূর্যদেব ও দিগ্মন্ডলকে সাক্ষী করে এই তোমার পাণি গ্রহণ করলেম, (হস্ত ধারণ) তুমি অদ্যাবধি আমার রাজমহিশি পদে অভিষিক্তা হলে।...

শর্মিষ্ঠা ।। আমার ভাগ্যে যে এত সুখ হবে, তা আমার কখনই মনেছিল না; হে নরেশ্বর, যেমন কোন যূথভ্রষ্টা কুরদিণী প্রান ভয়ে ভীত হয়ে কোন বিশাল পর্বান্তারালে আশ্রয় লয়, এ অনাথা দাসীও অদ্যাবধি সেইরূপ আপনার শরণাপন্ন হল! মহারাজ, আমি এতদিন চিরদুঃখিনী ছিলাম! (রোদন)

এ প্রনয় সম্ভাষণ হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে বলে মনে হয় না ।

মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা ‘কৃষ্ণকুমারী’ বাংলায় প্রথম ট্রাজেডি। এ নাটকের সংলাপে ইউরোপীয় আদর্শ অনুসৃত। বন্ধুকে লেখা পত্রে মধুসূদন জানিয়েছেন, সংলাপের ক্ষেত্রে তিনি ডক্টর জনসনের নির্দেশ ও শেক্সপীয়রের আদর্শ মান্য করেন-

This style is to be probably sought in the common inter-course of life, among those, who speak only to be understood without the ambition of elega-nce…and this advice ( of Dr. Johnson) Imean to adopt except where the thoughts rise high of their own accerdand clothe themselves with loftier diction and that will be the more tragic parts of the play.

সংস্কৃতাণুগ দীর্ঘ বর্ণনা মূলক সংলাপ, অকারণ কবিত্বের উচ্ছ্বাস নাট্য সংলাপকে ব্যাহত করে এই ভাবনা থেকে নাট্য সংলাপ কে তিনি কথ্য ভাষায় রূপ দিতে চেয়েছেন। নাটক যখন ট্রাজিক মুহূর্ত রূপ নেয় তখন চরিত্রের মুখে অলংকার পূর্ণ শব্দ বসে। সংলাপে চরিত্রের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। বাংলা নাটকে এর আগে কখনো প্রাকশ পায়নি। যার প্রমাণ---

ভীম সিংহ ।। ভগবান একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্বাদে রাজলক্ষ্মী এখনও ত এ রাজগৃহে আছেন, কিন্তু এর পর থাকবেন কিনা, তা বলা দুষ্কর । (২/১) মন্ত্রি, এ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়া অবধি আমি কত যে সুখভোগ করেছি, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। তা বিধাতা কি অপরাধ দেখে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন বল দেখি! এমন যে মণিময় রাজকিরীট এও আমার শিরে যেন অগ্নিময় হলো! (৫/১)

ভীম সিংহের যে গাম্ভীর্য, বিষন্নতা অতীতের স্মৃতি দীর্ঘশ্বাস এ সংলাপের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। স্বদেশ প্রাণ দুর্বল চিত্ত ভীম সিংহ এখানে প্রকাশিত।

জগৎ সিংহ ।। তুমি সখি, মদন-কেতু। যে স্থানে বায়ুচালনা কত্যে থাক, সেখানে কি আর বৃক্ষ থাকে? আনবরত কাম–দেবের রণভেরি বাজতে থাকে প্রসাদ–প্রেমযুধ উপস্থিত হয়, আর পঞ্চশরের আঘাতে লোকের প্রাণ বাঁচান ভার হয়ে ওঠে । (৪/২)

এই সংলাপে যে লঘুতা প্রকাশ পেয়েছে তা জগৎ সিংহের ব্যক্তিচরিত্রের দ্যোতক। লঘুচিত্ত, প্রবৃত্তিবশ, কামলোলুপ জগৎ সিংহের পরিচয় এখানে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথম সার্থক বাঙালি নাট্যকার মধুসূদন দত্ত রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন। সংলাপ রচনায় মধুসূদন দক্ষ তার পরিচয় দিয়েছেন। এর পরবর্তীকালে এলেন দীনবন্ধু মিত্র। সাতখানি নাটক ও প্রহসন রচনা করার সত্ত্বে ও দীনবন্ধু বাংলা নাটকের সংলাপ কে এগিয়ে দিতে পারেননি। তাঁর নাট্য সংলাপে ভাষার কোনো ক্রমবিকাশ নেই। সংলাপ রচনায় মধুসূদন সংস্কৃতনুসারী আদর্শ শর্মিষ্ঠা নাটকের পরে বর্জন করলেও, দীনবন্ধু তাকেই ধরে থাকলেন। রামনারায়ন তর্করত্নের ব্যর্থতাই তাঁর আশ্রয়। উচ্চশ্রেণীর পাত্র পাত্রী কৃত্রিম আড়ষ্ট অলংকৃত ভাষায় কথা বলে। এই ভ্রান্ত আদর্শ আনুসরণ হল দীনবন্ধুর ব্যর্থতা। নাটকে বর্ণনা ধর্মী ভাষার প্রয়োগ নাটকের গুণ নষ্ট করে। নীলকর সাহেব এর কাছে সদ্যপিতৃশোকাতুর নবীন মাধব তাঁর পুকুর পাড়ে নীল চাষ না করার জন্য অনুনয় করেছিলেন। প্রতিবাদে উড সাহেবের কদর্য উক্তি ও নিষ্টুর অপমানকার ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়ে নবীনমাধব সাহেবের বুকে লাথি মারে। নাটকে এই দৃশ্যটির আবতারণা করা হয়নি। সাধুচরনের বর্ণনাধর্মী সংলাপে আমরা তা জানতে পারি। দীর্ঘ, বর্ণনা ধর্মী সংলাপে এ নাটক ভারাক্রান্ত, যেমন সাবিত্রীর স্বগতোক্তি (৩/৪), নবীনমাধবের স্বগতোক্তি (৩/২)। উচ্চশ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে দীনবন্ধুর কোনো ধারনা ছিল না তা নয়, তা সত্ত্বেও তাদের মুখে তিনি কৃত্রিম সংলাপ বসিয়েছেন ।

সংলাপ রচনায় দীনবন্ধুর সার্থকতা দেখা দিয়েছে নীলদর্পণের নিম্ন শ্রেণীর চরিত্রের ভাষায় ও সধবার একাদশীতে ইয়ং বেঙ্গলদের ভাষায়। সংলাপ যে চরিত্রের বাহন হবে এর সার্থক রূপ পাই কৃষ্ণকুমারী নাটকে।

সংলাপ রচনায় দীনবন্ধুর ব্যর্থতার কারণ দেখাতে গিয়ে অনেকে বলেছেন, সে সময়ে বাংলা গদ্যভাষা নিশ্চয়তা লাভ করে নি। একথা ঠিক যে ১৮৫৮ ও ১৮৬২ সালের মধ্যে মধুসূদন ও বিহারীলাল বাংলা কাব্য ভাষার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সময় বাংলা গদ্যভাষায় তা হয়নি। ‘আলালের ঘরের দুলাল’ (১৮৫৮), ‘মদ খাওয়া বড় দায়’ (১৮৫৯), ‘সীতার বনবাস’ (১৮৬০), ও ‘হুতোম প্যাঁচার নকশায়’ (১৮৬২), বাংলা গদ্য বার বার পরীক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সে কারণেই দীনবন্ধুর ব্যর্থতা সে কথা বলা যায় না। কারণ এ সময়ে মধুসূদনের নাটক ও প্রহসন রচিত হচ্ছে। সম–সময়ে রচিত নাটক ও প্রহসনের তালিকাঃ রামনারায়নের ‘রত্নাবলী’ ও কালীপ্রসন্নের ‘সাবিত্রী সত্যবান’ (১৮৫৮), মধুসূদনের ‘শর্মিষ্টা’ ও কালীপ্রসন্নের ‘মালতীমাধব’ (১৮৫৯), দীনবন্ধুর ‘নীলদর্পণ’, মধুসূদনের ‘পদ্মাবতী’, ‘একেই কি বলে সভ্যতা’, ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ (১৮৬০), ‘কৃষ্ণকুমারী’ (১৮৬১)। সুতরাং একথা মানতে হয় প্রহসন দুটিতে ও ‘কৃষ্ণকুমারী’তে সংলাপ রচনায় মধুসূদনের সাফল্য থেকে দীনবন্ধু শিক্ষা গ্রহণ করেন নি ।

নীলদর্পণ নাটকের তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্ক (রোগ সাহেব কতৃক ক্ষেত্রমনির উপর অত্যাচার) কেবল নাট্যকারের ক্ষমতার ‘অগ্নিপরীক্ষা’ স্থূলমাত্র নয়, সার্থক সংলাপ রচনারও নিদর্শন ক্ষেত্র ।

ক্ষেত্রমণি ।। ময়রাপিসি! মোরে এমন কথা বল না, মুই পরাণ দিতি পারবো, ধর্ম দিতি পারব না, মোরে কেটে কুচি কুচি করে, মোরে পুড়িয়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারবো না, মোর ভাতার মনে কি ভাববে ?

পদী ।। তোর ভাতার কোথায়, তুই কোথায়; এ কথা কেউ জান্তে পারবে না-এই রাত্রেই আমি সঙ্গে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো । (৩।৩)

তোরাপ ও আর চারজন রাইয়তের ভাষা (২/১) বাস্তব ধর্মী সংলাপের উজ্জ্বল নির্দশন।

সধবার একাদশীর সংলাপ প্রত্যক্ষ, হ্রস্ব, তীক্ষ্ণ। এক্ষেত্রে মধুসূদনের প্রহসন দুটি দীনবন্ধুর আদর্শ। এর পরবর্তী কালে বাংলা নাটকে যোগ দেন গিরিশচন্দ্র। ১৮৭২ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত চল্লিশ বছর গিরিশচন্দ্র বাংলা নাট্য জগতে বিচরণ করেছেন। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের সংলাপ রচনা বিচার করতে গেলে এই তিরিশ বছররের ৬০/৬৫ টি নাটকের কথা ভাবতে হয় । নাট্য সংলাপ রচনায় গিরিশচন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব পদ্য সংলাপ-গৈরিশ ছন্দ, দ্বিতীয় কৃতিত্ব কথ্য ভাষাশ্রয়ী গদ্য সংলাপ। গিরিশচন্দ্র তৈরি করেন ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের গদ্য সংলাপ, যা নাট্য প্রয়োজনকে মেটায়। এরই নাম গৈরিশ ছন্দ। যার অন্য নাম ‘ফ্রি ভার্স’। এখানে প্রতি চরণে দুটি করে পর্ব থাকে। প্রত্যেক চরণে একটি পূর্ণ অর্থ বিভাগ, নিকটস্থ অন্যান্য চরণের সাথে তার সংশ্লেষ থাকে না। মধ্যে মধ্যে ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করে ছন্দের প্রবাহকে ক্ষিপ্রতর করা হয় ।

গিরিধারি, নাহি। বাহুবল তব, =৬+৬

চাহ বুঝাইতে। (তোমা হ’তে) আমি বলাধিক। =৬+৬

ক্ষত্রিয়-সমাজে-(কথা বটে) সম্মানসূচক, =৬+৬

ছল নাহি আমি। -অতি ছল তুমি, =৬+৬

মুক্ত কন্ঠে। করি হে স্বীকার ,=৪+৬

ছলে চাহ। ভুলাইতে, =৪+৪

ছলে কহ। আশ্রিতে ত্যজিতে, =৪+৬

চতুরের। চূড়ামণি তুমি। =৪+৬

(শ্রী অমূল্যধন মুখ্যোপাধ্যায়, বাংলা ছন্দের মুলসূত্র’ ষষ্ঠ সং, ১৯৬২, পৃ-৭২-৭৩)

‘পান্ডব-গৌরব’ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে, পঞ্চম গর্ভাঙ্ক থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি শ্রী কৃষ্ণের প্রতি ভীমের ঊক্তি। নাটকে এ অংশটি এইভাবে-

গিরিধারি, নাহি বাহুবল তব,

চাহ বুঝাইতে;

তোমা হতে আমি বলাধিক।

ক্ষত্রিয়-সমাজে

কথা বটে সম্মান-সূচক,-

ছল নাহি আমি, অতি ছল তুমি-

মুক্ত কন্ঠে করি হে স্বীকার ।

ছলে চাহ ভুলাইতে

ছলে কহ আশ্রিতে ত্যজিতে ;-

চতুরের চূড়ামণি তুমি !

(সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ১৯৬৯, পৃ-৫২৬)

এই গৈরিশ ছন্দের নাট্য-উপযোগিতা গিরিশ নাটকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে । এখানে সংলাপে আছে বেগ, দ্রুততা, ও তীব্রতা । গিরিশচন্দ্রের ‘রাবণ বধ’ নাটকে এর সূচনা। পরবর্তী তিরিশ বছরে এর বিচিত্র ব্যবহার। পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকে এই সংলাপ প্রথিত ‘এফেক্ট’ সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন নাটক তার প্রমাণ। সংলাপ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের ধারনা ছিল-

Dramatic dialogue মানে কথাগুলি এমন ভাবে গাঁথা থাকবে যে প্রত্যেক কথাই action indicate করবে । তাতে এক বা একাধিক চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলবে । কোনো কোনো সময় নাটকের ঘটনা সৃষ্টিতে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । একটি গদ্য সংলাপ তার প্রমাণ-

(সুভদ্রার প্রতি কুঞ্চকী)-‘তুই ঠেকে শিখেছিস, -ঠিক বুঝেছিস । কিন্তু আমি ও বুঝেছি,- অত ভালো ভাল নয়। র’য়ে স’য়ে দুটো হোঁচট মেরে যে দিকে হয় যাই বল! ভাবচিস, কে এ বুড়ো? অত ভাবনাতে তোর কাজ কি? তুই আপনার কাজ গুড়ো! কেলে ছোঁড়া বলেছে, অম্বিকা দেবীর স্থানে চল! না চলিস বল; আমি সাফ সোজা পথে চলে যাই! তোর কি চাই? কেলে ছোঁড়ার কথায় তোর ভালাই খুঁজি। যদি বুঝি, সুজি, তোর ভালাই নেই, সোজা পথে আপনি চলে যাই.’ (৩/৪ পাণ্ডব গৌরব)

এই কথ্যবুলি আশ্রিত সংলাপের লঘুতার আন্তরালে আছে ভাবগাম্ভীর। কঞ্চুকীর লঘুকতার আড়ালে উঁকি দিচ্ছে তার কৃষ্ণ-ভক্তি। তা ছাড়া, এই গদ্য সংলাপকে অন্ত্য মিলযুক্ত পর্বেও ভাগ করা যায় । যেমন-

তুই ঠেকে শিখেছিস

ঠিক বুঝেছিস। ......

আমি সাফ সোজা পথে চলে যাই!

তোর কি চাই?

কেলে ছোঁড়ার কথায় তোর ভালাই খুজি।

যদি বুঝি সুজি, তোর ভালাই নাই,

সোজাপথে আপনি চলে যাই।

শব্দ ও ছত্রের অন্তরালে এক মহত্তর সত্যের আভাস ফুটে ওঠে। এই ধরনের সংলাপ রচনায় গিরিশচন্দ্র সিদ্ধ হস্ত। আবার-

(নীলধবজের প্রতি বিদূষক)- ‘নিন্দে কি মহারাজ! সংস্কৃত করে এই কথা বল্লেই স্তব হ’তো! মুনিরা যে মন্তর আওড়ায় তার মানে বোঝেন? যতগুলি নাম বলে, তারনামে একজনের না একজনের সর্বনাশ করেছেন। নাম কিনা মুরারি, নাম কিনা ধনুর্ধারী, নাম কিনা কংসারি দানবারি, অরির একেবারে কেয়ারি! নাম কিনা ননীচোর, নাম কিনা বসনচোর, এই ছোট ছোট কাজগুলি প্রমের কাজের ভেতর ......ভবনদীর কাণ্ডারি কিনা! নৌকাভরা লোক তো চাই, দেহ ধরে এসে দেশে দেশে ফিরে লোকের সর্বনাশ করছেন তাই । (১/৪ ‘জনা’)

সামাজিক নাটকেও পদ্যসংলাপ রচনায় গিরিশচন্দ্র অভূত সাফল্য অর্জন করেছেন। প্রফুল্লর মতো বিষাদঘন নাটকের অ্যাকশান অনেকক্ষেত্রে সংলাপ নির্ভর। বলা উচিত এ নাটকের সংলাপ দ্যুতিময় ও ব্যঞ্জনা নির্ভর। যেমন-

যোগেশ ।। একি জানো, বিষ বল বিষ-অমৃত বল অমৃত;

জ্ঞানদা ।। ও খাওয়ার কাজ নেই, ও খেলেই বেড়ে যায় শুনেছি।

এই দৃশ্যে নাটকের ‘পতাকাস্থান’- সর্বনাশকারী কুচক্রী রমেশকেই জ্ঞানদার আহ্বান- ‘ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! শীগগির করে এস, সর্বনাশ হল’। এখানেই dramatic irony.

এই দৃশ্যেই আধপাগলা মদন সম্পর্কে ইঙ্গিত আছে উমাসুন্দরীর কথায়-‘ওসব লোক কি ধরা দেয়’। মদনের obsession প্রকাশ পেয়েছে একই উক্তির ব্যবহারে – ‘কি জান! বংশরক্ষা!- মদনই যাদবকে রক্ষা করবে, এখানে তার ইঙ্গিত।

জগমণির উক্তি- ‘মাই দুটো যদি কাটাতে পাত্তেম’- আর ‘রমেশই আমার কতকটা যোগ্য’- তার চরিত্রের আসাধারনের পরিচায়ক। চতুর শয়তান দেহে মনে সবল মতলবী জগমণির এই দুটি উক্তিকে শেকসপয়রীয় উক্তির সাথে তুলনা করা যায়।

নাট্য মন্দিরে শিশিরকুমার প্রফুল্ল নাটকের যোগেশ চরিত্রে অভিনয় করেন ১৯২৭ সালে। ১৮৯৫ সালে একই সময়ে ষ্টার থিয়েটারে অমৃতলাল মিত্র ও মির্নাভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র যোগেশ চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯২৭ সালে একই সময়ে নাট্য মন্দিরে শিশিরকুমার ও আর্ট থিয়াটারে দানীবাবু এই চরিত্রে আভিনয় করেন। ‘আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল’-এই সংলাপে যোগেশ-চরিত্রের ট্র্যাজেডি ব্যক্ত। জ্ঞানদার মৃত্যুদৃশ্যে যোগেশের হাহাকার এই মর্মভেদী সংলাপেই প্রকাশিত।

“এই দৃশ্যে শিশিরকুমারের যোগেশ এক কথায় অপূর্ব- মুখে কথা নেই, শুধু ভাবের লীলা চলেছে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে। সেই বেগ স্পন্দিত ভাবের প্রবাহে যোগেশের মনের কথা যতদূর ফোটাবার তা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারপর ‘আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল’- এই কথাগুলি বলবার সময়ে শিশিরকুমার তাঁর মুখে বারংবার যে কান্নামাখা হাসির অবতারণা করেছিলেন তা যেমন বিচিত্র, তেমনি অপূর্ব। এ হাসি তাঁর নিজের সৃষ্টি। কথিত আছে, গিরিশচন্দ্র এইখানে প্রস্তরীভূত মূর্তির মত স্তম্ভিত হয়ে থাকতেন, অর্ধেন্দুশেখর মুখ ঢেকে রোদন করতেন, অমরেন্দ্রনাথ অধীরভাবে চেঁচিয়ে উঠতেন এবং দানীবাবুও অর্ধ অচেতন মতন হয়ে থাকতেন”। (শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার, মণি বাগচী)

নাটকের শুরুতে সংলাপের যে ভাষা ছিল সেটি একটু একটু করে বদলাতে বদলাতে অনেক প্রতিষ্টিত সংলাপে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা নাটকের সংলাপ পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্টিত হল।

* আলোচ্য অংশে রবীন্দ্র নাটকের আগের নাট্য ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হল ।

গ্রন্থপঞ্জি-

১। শতবর্ষে নাট্যশালা, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কলকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৩।

২। শতবর্ষে নাট্যশালা, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কলকাতা,জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৩, প্রবন্ধ-নাটক মৌলিক ও বিদেশী-অজিতেষ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

৩। শতবর্ষে নাট্যশালা, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কলকাতা,জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৩, প্রবন্ধ- থিয়েটারের ভাষা ও তার বির্বতন-ডঃ বিভূতি মুখোপাধ্যায় ।

৪। শতবর্ষে নাট্যশালা, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কলকাতা,জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৩, প্রবন্ধ- শিশিরকুমার ও নাট্যপ্রয়োগকলা-পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ।

৫। শতবর্ষে নাট্যশালা, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কলকাতা,জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৩, প্রবন্ধ- বাংলা নাট্যপ্রয়োগরীতি-সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ।

৬। শতবর্ষে নাট্যশালা, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কলকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৩, প্রবন্ধ- নাট্যকার দীনবন্ধু ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ-ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত ।

৭। বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কলকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬৪।

৮। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কলকাতা, এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লি, ১৯৬১ ।

৯। বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ, কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪২০, প্রবন্ধ-বিশ শতকের বাংলা নাটক : একটি অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন-সৌমিত্র বসু ।

১০। বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ, কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪২০, প্রবন্ধ-বাংলা নাটকের ভগীরথ রামনারায়ন তর্করত্ন-আশিস খাস্তগীর ।

১১। বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ, কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪২০, প্রবন্ধ-‘নাট্য’ থেকে ‘পাঠ্য’; উনিশ শতকের বাঙালির নাটক-দর্শন-নির্মাল্যকুমার ঘোষ ।

১২। বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চ, কোরক, শারদ সংখ্যা, ১৪২০, প্রবন্ধ-মঞ্চ-সুনন্দ অধিকারী ।

**Glimpses of Cultural Traditions in Jangalmahal through *Bandna* *Parab* and *Chhou* *Naac***

***Shaktipada Kumar***

Research Scholar,Department of English

The English and Foreign Languages University,

Hyderabad

**Introduction**

The region known as *Jangalmahal* i.e. Purulia, Bankura and West Midnapore Districts of West Bengal are collectively known as *Jangalmahal* is the western part of West Bengal and a part of *Chhotnagpur* plateauwhich is full of forests and mineral wealth and these natural sources always attracted the eyes of the outsiders or plunderers. And this vast natural source of wealth leads to the rise of diverse exploiters for which the life of the aboriginals of the region became very difficult because of the strong clutches of the exploiters. This was the picture at the end of the 19th Century when Birsa Munda came into the field like a phoenix to protect his neighbors from the black hand of the plunderers. This social revolution makes the British Government to think about the condition of the tribal people and to make them free from the shackle of the exploiters.

This place has a different colour and culture, sight and sound, taste and tradition, life and livelihood. The way they live and the way it reveals to others are different in many ways. Like the circle of the seasons they have circle of cultures that comes and goes in a roundabout way through the whole year having different sense and meaning and importance of its own. This place has different forms of songs and dances, the songs and dances explain the life style of the people.

How much they are close to nature, tradition, and culture can be seen in their songs and dances. The songs are like *Jhumur, Baul, Jawa, Tusu, Vadu, Ahira, Beehar geet* etc and among the dances *Chhou* and *Natua* are famous. These songs and dances are the outcome of their busy life’s sorrow and happiness. They have different festivals; if I use a Bengali proverb then it would be clear *“Baro mase tero parbon*” means ‘thirteen festivals in twelve months’. If we go deep and analyze these songs, dances, festivals then we would be able to get the meaning of all these and could see how close they are with the nature, how they live with the nature, how they share their feelings with the animals and plants, how much they are grateful toward nature and animals. In this connection the sayings of W.W. Hunter about the rural Bengal in his famous book “The Annals of Rural Bengal” worth mentionable.

“I have endeavoured to delineate the inner life of those distant Asiatic nations over whom a branch of the Anglo-Saxon Family has been called to rule. Separated from us by half a world, their vicissitudes, social necessities, and religious cravings are nevertheless pregnant with interest to all who would contemplate the picturesque yet painful stages, through which lies man's route from barbarism to civilization and assured faith. The grand problems of life are everywhere the same. It is in the solution of them that races differ.”

*Kalipuja/ Bandna Parab*

**Mythology Behind *Bandna Parab*:**

According to the mythology, in the ancient period when human civilization was in its very commencing period Lord Shiva used to provide food for long time but when the number got multiplied then He advised Man to produce their own food through cultivation. In this period Man used to produce their food by their own effort but later they requested God for His suggestion as the work was very hard. Then Lord Shiva provided some cattle on the condition that they would take care of the animals. In the beginning the relation between Man and Animal was cordial but with the passage of time it worsened and subjected to severe beating. When the animals couldn’t endure the amount of pain inflicted by Men they complained against Men to Lord Shiva. Lord Shiva then secretly decided to come to the earth on the new moon in the month of *Kartika* to see the condition of the animals. This news was given by Narada to the humans then the clever, intelligent Men started clearing the courtyard, their houses and cowsheds. Before the day of *Amabashya* (new moon) Men start washing their animals and smearing oil and vermilion on their horns and foreheads providing enough grass and *diwa* (earthen lamp) in the dwelling place of the animal throughout the night. Day after new moon God had seen that Men were worshipping the animals with different offering and sacrifice and the next day animals were playing with humans accompanied by different musical instruments and *Ahira* songs. Therefore the complaint against Men couldn’t be proved. The next year also went the same complaint and Men followed the same procedure and thus the *Bandna Parab* continues to retain its tradition.

**History of *Bandna Parab***

Festivals and cultures are closely associated to each other. Men celebrate their festivals in order to get relief from their monotonous, tedious day to day life. The festivals in the agriculturist community are closely associated with the work of agriculture and in are not away from the agriculture, the festivals come under their agricultural activities. The human relationship with the animal and the regards, the tribute towards cattle, the thanks giving ceremony to the cattle in lieu to the continuous and constant help in the work of agriculture is *Bandna Parab*.

*Bandna Parab*, is not a new festival; it has its beginning from the very ancient period when men discovered how to cultivate and this festival especially reveals the reality of cultivation, it shows the sources of cultivation, the process that human being applied for the work of agriculture. When the people of *Jangalmahal* celebrate their *Bandna Parab* then this festival goes as *Diwali* to the rest of India. *Bandna Parab* itself is a kind of *Diwali* but not exactly and only *Diwali* but at the same time simultaneously it refers so many things and it has its own jungle flavor, it’s a different way of celebrating *Diwali.* The most essential thing about this *Bandna Parab* will be incomplete without a picture directly from the *Parab.*

The above picture has its own name as *Kaarakhunta* (Binding a buffalo with rope) in *Jangalmahal* and this is not only done to the buffalos but the other animals as well like the Bull, Lamb, Got, generally the animals a farmer uses for the work of cultivation as his company both physical and mental.

If we go deep to illustrate this picture then we would get the essence of this act of doing *Kaarakhunta*. This is generally done in an open field where a buffalo or bull or other animal after binding them with a strong and thick rope in a tree or in a *Khunta* (an unbreakable long and thick wooden piece) which is pushed deep into the soil and then with the upper part of that *Khunta* is used as tree to bind the animal. And then a man would make the animal irritate continuously with the help of o big leather through keeping the leather on the horns with songs ( *Ahira songs*) and the music of *Dhak, Dholok, Nagara, Madol* (name of musical instrument). This is enjoyed by all the villagers with great pleasures. What does it mean? What is the history behind this *Kaarakhunata*? Why do the people of that area still doing this? To answer all these questions we need to look back further into the ancient period when men first came to know about cultivation. In order to use the animal power in cultivation men started bringing the cows and buffalos at their home. And this process of *Kaarakhunta* explains the theory how to charm the animals in the then time. This action of *Kaarakhunta* somehow reminds me of Spanish bullfighting.

**Different** **aspects of *Bandna Parab***

*Bandna Parab* is not just a single festival rather it is associated with so many aspects of life of the people. *Bandna parab* is very much associated with agriculture and it’s a kind of celebration and tribute to the animals used at the time of cultivation and in that sense it’s a cattle festival. After the hard work of cultivation, performed by the animals and human power, human are grateful to their cattle. Therefore it shows that how the people lived near the heart of nature in the jungle is grateful towards animal world and they worship the animal as their God. In that area cows become God to the farmers and that’s why they worship with all sorts rituals to the cows at the time of *Kalipuja.*

It is believed that the Lord Shiva first used cows and bulls in agriculture and He first brings the animal from the jungles and hills and appointed them in agriculture. His wife Leelabati distributed this animal to all the houses on the earth. How the farmers remember Lord Shiva can be found in their Yoke, there is an upper part in the middle of the yoke that is known as seat of Shiva marked with three straight line of *sindur* (vermilion).

Men are the most rational animal in the world and very generous and conscience. The farmers especially in *Jangalmahal* are *Kumhar, Kurmi, Santal* and others, they think after their agriculture that what they have given to their animal after the toilsome work of agriculture, and have given the main power to agriculture. The animals have contributed their part in agriculture and in their honour the farmers started their *Bandna Parab* as a kind of tribute to them and to express their gratefulness towards them. Before harvesting the golden crops from the field *Bandna Parab* is to let them take part in the enjoyment with the human being. It’s a joint enjoyment of animal and human seeing at the golden crop in the field which they have produced through a long time and hard work. Different ways of use animal power in cultivation can be seen through the following pictures-

Before the starting of *Bandna* *Parab* the mud houses of the region appears with the colours of the red soil, and this festival is a kind of restructuring their mud houses, the houses that became faded after the heavy rain of rainy season. They don’t have colour to colour their houses but they have their nature, the natural colour from the soil. People of that region boil the red soil (*rugri maati*) with water and from that they get a red color which they use on the walls of their houses after applying another kind of soft soil on the wall. Let us take a picture where the houses are colored directly from the colour of nature

So this is how they renovate their houses, coloured their houses to protect from the rain. The wall, the thatched roof, the colour are all made by soil.

This is the time of *Diwali* to the rest of India. *Diwali* is the festival of different types of light, *Bandna* *Parab* also reflects the same thing, the festival of light, but not the light of electricity, they use soil lamp with oil and ghee.

The main rituals of Bandna can be divided into six parts- *Tel Dewa, Ghawa, Omabashya, Goroiya, Bolod Khunta* and *Buri Bandna*. The brief discussion of these different parts is following

1. ***Tel Dewa*:** The part, ‘*tel dewa’* of *Bandna Parab* is about applying oil on the horns of the animals including cows, bulls, and buffalos. This is done in the 13th day of dark fortnight in month of *Kartika*. The festival begins by smearing oil on the horns of the animals and that day farmers bind a bell on the neck of each animals and the sound of this bell makes them feel pleasure. Cow is considered as Maa (mother).
2. ***Ghawa*:** 14th day of dark fortnight of the month of *Kartik* is known as *ghawa*, part of Bandna Parab. This day is also to clear away all the garbage from around the house and people starts sketching their wall with different types of pictures on their wall, everyone is busy to decorate their houses-
3. ***Omabashya/Jagran*:** *Omabashya* or the day of new-moon is the busiest among the five days of Bandna Parab. All are busy with different types of works, women are busy with mking dust out of rice known as *Guri* in order to make different types of cake/ pitha from that rice powder mixing milk and molacese and other things as well. The process of making dust out of rice can be seen through the following picture. The machine is known as ‘Dhenki’ which is in its dying position in the world of globalization and technology and different shorts of electrical machine. This is the first machine,made out of wood with a small iron part to make rice out of paddy and that is gonna extinguish. Now it is rare to find it out even in the villages. Only few houses in the villages still have this ‘*Dhenki*’(husking lever).

*Injar Pinjar***:** *Injar Pinjar* is one of the most important events on the day of new moon. *Injar pinjar* is basically lightning and breaking the jute sticks. This has a very deeper meaning, it unveils the fact that in prehistoric period or even today men are fear of darkness and of wild animals, and this lightning, making sound by breaking the jute sticks illustrates the fact that they do this in order to drive away the darkness of the night and to be secure from tiger like ferocious animal. Still this process of breaking and lightning of jute sticks *(Sonkapati*) are prevailing in that that region.

Tonight is a kind of sleepless night and this sleepless night is called *Jagaron*. After the dinner people came to all the houses to adore the cows, bulls, buffalos with their *dhak, dholok, madol* with Ahira songs, especially designed for one and only purpose i.e. for *Bandna* *Parab* to invoke the animals, in order to adore them. The group of people who come for this purpose is called *Dhinguan*.

 The owner of each house welcomed the *Dhinguans* by giving them Cakes, money and rice also. And with this money they use to have *Handiya* (a kind of alcohol) in the next day with full on enjoyment. In this region the number of *Bandna Geet* or *Ahira* is limitless, nobody knows how many songs are there because most of the songs are in oral tradition, and there is no written form of the songs. And that’s why most of the lyrics of the songs are in a decaying position with the death of the older people and the people with modern attitude, the men with technology and globalization avoid such practices. Therefore the future of this long primeval tradition is in its dying position. The language has already been in a position of transformation. Most of the people are busy to follow the considered standard Bengali language; therefore the traditions are in a very pathetic situation.

1. ***Goroiya/ Gohal Puja*:** The first day of light fortnight in the month of *Kartik* is the day of *Goroiya*. Today is the day of invoking of Gosain Rai and for this homage no priest is needed, each and every farmer is a priest, they worship with their own words not by the words of priest, they adore the animal, the yoke, the cowshed, plough and other instrument used for agriculture. Today the painting of Purulia is really a thing that attracts the attention of any people, this is known as ‘*Chok dewa*’ a kind of ‘*rangoli*’ with the use of rice dust mixing with water and some natural gum on courtyard of each and every house. Some pictures are due for this *Goroiya* are following-

**5*. Bolod Khunta*:** *Bolod khunata* is the most charming part of *Bandna Parab*. I have mentioned above about *Kaarakhuna, Goru khunta* i.e. the act of binding the animal with a strong rope and to make them irritate with songs, music and using long cloth like leather on their horns in order to thrust by the horns of the animals and will tear out the leather.

*Chhou* Dance

**History of *Chhou* Dance:**

Before going forward to say anything about *Chhou* Dance I must mention that in this area I will focus exclusively on *Purulia* *Chhou* Dance.

Like the other traditional art and culture *Chhou* dance is also a traditional dance form. How little we know and how trifle we care about our tradition, our root would be clear if we look at our traditional dances, songs and other different art form. These are the lesser known art form but retain the history of our root and show how things grow and changes. There are so many traditions in the dying position and that is because of our negligence and less care to those art forms. There is very few information about the history of *Chhou* dance. This is a different genre of Indian folk dance and is famous in three states of India named West Bengal, Jharkhand and Odisha. According to the development and origin of *Chhou* have three subgenres-Seraikella, Mayurbhanj and Purulia *Chhou.*

Among these three subgenre Purulia *Chhou* is a very vibrant and vigorous and very important form of Indian folk dance. The phrase *chhou* dance and the name Purulia District became synonymous to each other. The famous folk dance or more appropriately saying dance drama is a rare form of dance among the other neoclassical dance dramas like *Bharatnatyam*, *Kathakali*, *Kuchipuri*, *Kathak*, *Odissi* etc. *Chhou* dance is a very old form of Indian folk dance.

**Mythology related to *Chhou* Dance**

*Chhou* dance is generally performed at the time of *Chaitra* *Parab* and is associated with agriculture like other festivals of the area. *Chaitra Parab* is held in the *sankranti* of the *Chaitra* month that is 13th April. And this is the time when the people felt extreme scarcity of water and the temperature is very high. This is somehow related to the primitive idea of the movement of sun in the sky and to control the rainfall by the sun god. This dance is a kind of prayer to the sun god to produce rainfall. And the ritual said that Lord Shiva performs as the Sun God and Parvati as the earth Goddess. Sun God Shiva and earth Goddess Parvati are ceremonially given marriage in order to make happy the Sun God so that He could produce rain in favour of the people. Therefore to hold this tradition, this dance is very much important for the agricultural people. That is why whenever there is a *chhou* dance programme the starting event is always dedicated for the invocation of Lord Shiva and one more noticeable thing is that chhou dance usually is performed near the courtyard of Shiva temple. Almost each and every village must have Shiva temple and *Chhou* dance is performed near that temple. And besides that Lord Shiva is the God of dance, so this *chhou* dance is also a kind of tribute to the Nataraj. To describe and to say about *Chhou* dance it must be a failure if I do not mention some rituals and traditions which are related to *chhou* dance and *Chaitra* *Parab* or *Shivaganjan* is due to some pictures of *Bhogtaghura*





**Folk Dance and *Chhou***

Whenever there is a discussion about folk dance or any folk art we have a wrong notion about it and always mean folk art as village art. But this notion is not right, folk comprises the common people of both the urban and rural areas, therefore folk art is the art of common people ant merely art by village people. The English word ‘folk’ derives from the Germanic word ‘folc’ which means common “people”, “men”, “tribe”, “multitude”. So therefore no such specification of village art, folk art is the art of common people. This art might not be sophisticated and might not have been refined to be included in that of classical, but it has its own rules, rigidity and beauty, for which it can be easily be classed under separate group other than the classical. Folk art has its own characteristic richness and grandeur. Some examples of classical dance India

|  |  |
| --- | --- |
| State of Origin | Dance Form |
| Bharatanatyam | Tamil Nadu |
| Gauriya Nritya | West Bengal |
| Kathak | Uttar Pradesh |
| Kathakali | Kerala |
| Kuchipuri | Andhra Pradesh |
| Manipuri | Manipur |
| Mohiniyattam | Kerala |
| Odissi | Odisha |
| Sattriya | Assam |

**Examples of some folk dances in India**

*Banjara, Batukamma, Dappu, Dhimsa, Changu, Budabukkala*- Andhra Pradesh

*Kavadiyattam, Kaliyoottu, Chaliyapporattu, Theyyam, Vellakalli*- Kerala

*Karaga, Karadimajal, Nagamandala, Yakshagana*- Karnataka

*Kolattam, Oyilattam, Devarattam, Bommalattam, Puliyattam*- Tamil Nadu

*Bihu, Bagurumba, Zikirs, Khamba Lim, Dhuliya*- Assam

*Ranapa, Dhap, Dalkai, Ghumra, Baagh Naach*- Odisha

*Bhangra, Daankara, Luddi, Dhamal, Gatka, Giddha*- Punjab

*Dangi, Naati, Sikri, Singhi, Kariyala, Hikat*- Himachal Pradesh

*Chhou, Alkap, Gambhira,Nacni, Domni*- West Bengal

More than 80% of the total population of India is rural population and in folk dance is considered as peasantry and in that case it can be unhesitatingly being said that folk dance is the art of the village folk. There is a very marked distinction between folk dance classical dances, classical dance is more refined and is associated with the elite class of people, but unlike the classical dance folk dance is meant for the sheer pleasure of the performers and not for the entertainment of the public. The emotion expressed in the classical dance on stage is artificial but in folk dance it is original and natural because in folk there is no such highly ornamented stage for the sake of public’s enjoyment rather it is for the enjoyment of the performers. The importance of folk dance and its aesthetic value can also be understood from the remark of Washington Irving that the character of a people is often to be learnt from their amusement; “for in the hour of mirth, the mind is unrestrained and takes its natural bent”.

Rabindranath Tagore also said that “dancing is the expression of life’s urge” and according to the Hindu conception dancing is elixir of life. And elixir of life is something without which we can’t live and the answer obviously will be water and pure water is *Amrta* (nectar), essential for endurance.

The progress in the folk dance is the reflection of the progress in civilization because this is the progress of common mass and the refinement in these dances are quite noticeable. And the growth in the folk dance, folk song, folk art and culture is the mirror of a nation because to some extent it manifests the nation’s temperament, simplicity, social status, customs and creed. The real develop of a nation is the development of the life, the art, the culture, the dance, the song of the common people. One can also say that folk dances are of greater importance for being the direct and unsophisticated expression of the innermost spirit of India and show the closeness of the pastoral people with nature, the great source of everything to them. Projesh Banerji in his *Aesthetics of Indian Folk Dance* says that “any cultural effort would lead humanity from bondage to freedom, from misery to happiness, from gloom to light”

During the time of Pal dynasty we could know from Ramcharita kavya about the devdasi dancers of Gauda Banga. Padmabati, the wife of poet Joydev (12th century A.D.) is also said to have been a classical dancer. Gauriya nritya has its element of Chhou, the heroic dance. The visual grandeur which could not be captured in words can be represent through some photographs







**Uniqueness of *Chhou* Dance**

*Chhou* dance is a unique folk dance of India; it is unique in different ways. The basic features of this dance includes this dance is exclusively designed for male members, the use of mask; the musical instruments are also different. The masks used in the *Chhou* dance are like following brilliant handicraft of the people





In a book named *Narratives from the Margins* by Sanjukta Das Gupta and Raj Sekhar Basu where Giorgio Milanetti said that “Ramcharitamanas is a story about tribes. It took me a long time to realize the fact that the Ramcharitamanas tells a story of the tribes, with the tribes, for the tribes.” Some of the issues addressed in the volume *Narratives from the Margin* by Gupta & Basu are the genesis and development of tribal studies in India during the colonial period

**Body Languages in *Chhou* Dance**

Body languages in *Chhou* dance is very important and can help a lot to understand about the people of the region. It is clear from the dance that the people who perform are very diligent and have a very fitful body. And seeing the body movement of the dancers one can easily understand that how much laborious they are. Basically all the dancers are farmers and the time when *Chhou* dance is performed is the time of gap between harvesting and new beginning of cultivation. So it is all about a kind of preparation for the cultivation both mentally and physically and a good way of invocation to the God of rain. This is the only time when these people get a time of leisure in the midst of hard agricultural work. Body movement is exceptionally vigorous and it is really difficult to express in words even images can’t express to understand the movement is due to watch the performance. Performing arts in evoke a rasa in the audience by the performers. The details of these rasas are described by Bharata Muni in his famous dramatic theory *Natyashastra* where he shows eight different rasas (emotion) corresponding eight bhavas (mood) along with the colours of the rasas are following

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sthayee Bhava | Rasa | Corresponding | Colour |
| *Rati* | *Sringara* | *Syama* | (Dark blue) |
| *Hasa* | *Hasya* | *Sita* | (White) |
| *Soka* | *Karuna* | *Kapota* | (Dove) |
| *Krodha* | *Rudra* | *Rakta* | (Red) |
| *Utsaha* | *Veera* | *Goura* | (wheatish) |
| *Bhaya* | *Bhayanaka* | *Krishna* | (Black) |
| *Jugupsa* | *Beebhatsa* | *Neela* | (Blue) |
| *Vismaya* | *Adbhutha* | *Peeta* | (yellow) |

Rasa produced at the time of *Chhou* performance is of *Veera* and *Rudra* but to produce these rasas are very difficult because at the time of chhou performance there is no presence of face, face is under mask. Therefore whatever *rasas* they produce they need depend on different *Chal*/gait and this makes chhou dance unique. Here in this dance body movement is everything, nothing to do with facial show, the terrible body fitness beat everything else.

**Present condition of Chhou Dance**

The present condition of *Chhou* dance is incredibly significant. Now this dance is in such a position that it can be stand in between the classical dances and folk dances. This transformation is really interesting. At first this dance was performed by Hindu people especially the aboriginals and sub aboriginals of that area but now it is attention-grabbing that the Muslims are participating in the Purulia *Chhou* dance. Therefore this remarkable progress in Purulia Chhou shows that the art and the artist are beyond human boundaries like race, religion, origin, color etc. And one more thing about Purulia chhou is that though it is a folk dance and generally performed for the sake of the performers and not for public’s sake but now the situation changes, now it gets its status of public interest and this became a means of interest as well as a part time income for the performers. There are so many artists who performed this dance in so many countries and also got Padmashree award from Indian Government. In this connection I must mention the name of Gambhir Sing Mura who is the father of Purulia *Chhou* and was conferred Padmashree award by Indian Government for his brilliant performance in both home and abroad and it is mentionable that he performed in 108 countries is not a simple matter. The future of *Chhou* dance is desirably a nice one. Though at the time of transformation of anything in the world is bound to loss something and at the same it gains something, same thing applied to this dance also. Though it’s going to lose some traditional flavor but it will gain some modern flavor and is becoming and gaining its global value that is important. Modernization in *Chhou* dance can be seen in a very pain staking study of chhou dance, but in general it can be said that this dance is in a very good position and increasing its importance day by day.

The themes of *Chhou* dance is drawn from the two great epic named Ramayana and Mahabharata and sometimes Puranas. And here also we can see the progress in Purulia *Chhou* in matter of using the themes, now-a-days they are using many present condition of society as the theme of the dances. Like there is a Pala (an event of chhou dance) named Roktejhora Kargil (the battle between Indi and Pakisthan regarding Kashmir/ Kargil war) and many other such events as the theme of *chhou* dance.

In a project named The Asian Traditional Performing Arts (ATPA) sponsored by The Japan Foundation began in 1976 to find out the traditional songs and dances of Asia were continued up to 1981. The project had three parts, “Asian Music in an Asian Perspective”, “Musical Voices of Asia”, “Dance and Music in South Asian Drama”. Third event ‘The Dance and Music in South Asian Drama’ was held in 1981 in Japan where musical themes were combined with the interrelated field of dance and theater. This gives us information on traditions, performance, the performer, and the items performed, the four traditions examined in the event include Purulia chhou, Seraikella chhou, Mahakalt pyakhan, Yakshagana these are the form different dance drama form of different places. Purulia chhou is the dance form of Purulia district, West Bengal, Seraikella chhou is the dance form of Singbhum district, Bihar, Mahakalt prakhyan, a dance drama from Kathmandu, Nepal and Yakshagana is a dance drama frm of Kandra District, Karnat

***Bandna* & *Chhou***

Bandna and Chhou are different traditions and cultures of Jangalmahal. There is no common link between the two except one and only common ground which is prevalent in almost all the festivals of the place and that is both are related to agriculture with different way. Kalipuja or I must say Bandna parab is the time of celebration of gathering crops from the field and to give a thank to the cattle, a tribute to the cattle and to share the enjoyment with the animal while *Chhou* Dance is the dance performed at the time of April- May in order to bring rain through invoking the Sun God i.e. Lord Shiva so that the people can prepare for the next agricultural year. And this time is the crucial time for the people of that place because of high scarcity of water and the sun scorching is at its climax. This time is fearful, panic to the people where the landscape transformed into a desert, and *Chhou* Dance is the only way to invoke the Sun God, God of Dance, Nataraj, Lord Shiva in order to bring rain and to save the lives of the people and the hope for a new good year of agriculture.

Therefore it would be wrong to say that there is no link between the two. It is the agriculture that binds, strings together the two poles of agriculture. Bandna parab is celebrated at the end of a hard agricultural work and Chhou Dance is performed before the beginning to undertake the heavy and hectic work of agriculture. So chhou dance is a kind of warming up the body and to be fitful to undergo into the field of agricultural field.

**Bibliography**

1. Arden, John. “The Chhou Dancers of Purulia.” *The Drama Review: TDR* 15.2, Theatre in Asia (Spring, 1971): 64-75. Web. <http://www.jstor.org/stable/1144621?origin=JSTOR-pdf>.
2. Banerji, Projesh. *Aesthetics of Indian Folk Dance.* New Delhi: Cosmo Publication, 1982. Print.
3. --- *Illustrated Basic Concepts of Indian Dance.* Varanasi: Chaukhambha Orientalia, 1984.
4. Butler, Judith. “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory.” *Theatre Journal* 40.4 (Dec. 1988): 519-531. Web. <<http://links.jstor.org/sici?sici=0192-2882%28198812%2940%3A4%3C519%3APAAGCA%3E2.0.CO%3B2-C>>
5. Chaudhury, Sukanta K.  *Tribal Identity.* Jaipur: Rawat Publishers and Distributers, 2004. Print.
6. Das Gupta, Sanjukta and Raj Sekhar Basu. *Narratives from the Margins: Aspects of Adivasi History in India.* New Delhi: K.K.Agencies, 2011. Print.
7. Dhagamwar, Vasudha. *Role and Image of Law in India: The Tribal Experience.* New Delhi:Sage Publication, 2006. Print.
8. Dhan, A.K. *Birsa Munda,* Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 2006. Print.
9. Dutta Sharma, Kaushik. "The Calcutta International Theatre, Dance, and Martial Arts Seminar and Festival: A Week of Revelation and Confusion." *Asian Theatre Journal* 6.2 (Autumn, 1989): 194-201. *JSTOR*. Web. <http://www.jstor.org/stable/1124460>.
10. Hunter, W.W. *The Annals of Rural Bengal*. New York: Leypoldt and Holt, 1868. Print.
11. Kocheriakota, Srilekha. *An Introduction to Indian Dance.* Hyderabad: Karshak Art Prnters, 2011.
12. Mahato, Sadhan. (*ed.) Marangburu* 2.2 (2009)*.* Kolkata: Jayashree Press. Print.
13. Mohanta, Basanta Kumar, and Sudhanshu Shekhar Mahato. "Bandna Parab-- a Thanks Giving Ceremony of the Kudmis." *The Orissa Historical Research Journal*. Web. <http://orissa.gov.in/e-magazine/Journal/Journal2/pdf/ohrj-09.pdf>.
14. Mukhopadhyaya, Durgadas. *Lesser Known forms of Performing Arts in India.* Delhi: Sterling Publishers, 1978. Print.
15. Purulia Page, *Facebook*. Web. <https://www.facebook.com/puruliacity?fref=ts>.
16. Reck, David. “The Music of Matha "Chhou".”*Asian Music* 3.2, Indian Music Issue (1972): 8-14. JSTOR. Web. <http://www.jstor.org/stable/833954>.

## Saha, Apurba. Paintings of Purulia. [The Humanities Collection](http://ijh.cgpublisher.com/). International Journal of the Humanities [9](http://ijh.cgpublisher.com/product/pub.26/prod.1987).10: 215-234. Print.

1. Sen, Suchibrata. *The Santals of Jungle Mahals: An Agrarian History 1793—1861.* Calcutta: Ratna Prakashan, 1984. Print.

**‘Kochi’ as Cinematic City: A study in contemporary Malayalam Cinema**

***Sreedevi.P.Aravind***

Research Scholar

Department of Philosophy

Calicut University

“Where is the cinema? It is all around you outside,all over the city, that marvelous, continuous performanceof the film scenarios”

* Baudillard

**CINEMA AND CITY**

As an industrial product, cinema is an urban art-form. Historically, cinema was born in city. Lumier Brothers’ *Panorama of the Arrival at Perrache Station* is considered to be the first cinema. In the very first track shot of the film, camera opens its eyes to the urban images: On the screen a train slowly roars into the city. There is not even a single human being on the roads. Far off, there is a factory chimney, and there are some other urban images around. Much before this, (in October,1888) Louis Lee Prince, a French inventor, shot the Leeds Bridge near the South-East Corner of London by placing his camera behind the window. It was the busiest moment of the day. The bridge is seen through the winter sunshine. People travel on the bridge. On the one side of the bridge, there are horse- carriages and on the other side, Victorian hotels and workhouses: A man wipes his nose; a lady walks with a parcel; two men talk, sitting on a parapet. This might be the first image of a city shot by a movie-camera.

Cinema is not merely a way of narrating events. Deleuze is of the opinion that rather than a different way of artistic manifestation, cinema is to be viewed as an important event in modern life. Cinema severed the visible from the human eye. That which is visible through the camera becomes a ‘visual’ on the screen. In other words, it becomes detached from the perspective. When we watch a movie, what are seen on the screen are visuals. (Spectacles). Same is the case with watching a photograph. When does “what is visible” become a “visual” (spectacle)? Normally, when we see an object, the visible is embedded in our eyes. It is an inseparable part of our perspective. In contrast, what camera does is to give an independent life to the visible. This was indeed a revolution in the history of human engagements with the world.

So, it can be said that it is the gaze of the camera that made the visible reality a ‘visual’. In the context of our discussion of the city-image this becomes clearer. Before the accomplishment of camera- gaze, a city might have been a lived experience, something not detachable from the experiencing subject. It was camera that “presented” the city as a visual reality for us. Cinematic representation of the city is not to be understood merely as a *re-presentation*, the presentation of something that was already there. It ‘frames’ the city and it is through this framing that the city is born. It is an act of articulation; Cinema articulates city ‘in its own image’.

Noted film-critic C.S Venkiteswaran observes, for a villager who comes to a city in search of new life, the city appears like a ‘cinema talkies’. The experience of cinema appears to be similar to the experience of city in many respects. Light and speed are two of the factors that are common in both the experiences.

In a sense, cinema is an ‘art of lighting’. It is not merely because that a camera is moved and angles are fixed after proper lighting is provided. The images that get imprinted in a camera acquire different manifestations through lighting. In French, a Lumiere is a light, the light. In English it is a fancy light. It is the Lumiere brothers, who had first lit up the city for their movie. Likewise his name reflects symbolically with the history of cinema. City is a ‘lighted space’ at the experiential level. It is with the lighting of the electric lamps, the city assumes its visual character. Speedy movements of human beings and also the vehicles that we experience in the urban life are similar to the rapid movements of the images within the experiential world of cinema. The mobile gaze and the window-frame gaze from a train, bus, tram, etc., can be placed along with the visual and the emotional experience provided by the cinema.

THE DIGITAL NOMADICITY

It is a known fact that cities are formed on the banks of rivers. Settlement started when the nomads began to live permanently on the banks of the rivers. These areas were later transformed into cities. It means, city-dwellers are originally nomads. They dwell in a place where they happen to reach. At the same, they originally do not belong to any particular place: They do not have a sense of belonging to the place they live. May be, it is because of the same reason that the city remains strange to itself. Strangeness is one of the fundamental aspects of urban life. In a significant sense, nomadicity constitutes ‘the unconscious’ of the city-life. The same kind of nomadicity is express in cinema as an art-form and as an industry. Cinema has always been nomadic. It might be because of this internal inspiration of the unconscious that cinema always been roaming. From its birth itself, cinema has been roaming around the world. This may be called digital nomadicity.

The first film-screening was carried out in 1895 December 28th by the Lumiere Brothers at Grand Café in Paris. After only six months, the first film was screened in India. In 1896, Lumiere brothers conducted a film screening session in Bombay. Today, cinema has moved out of the celluloid (leaving cinema theatres and crowds) and entered almost each and every house in the form of DVDs. Cinema has come out of the theaters in search of individuals. More importantly, we have reached a stage where cinema is something that can be created even by a single person sitting in a room.

Perhaps, the above mentioned nomadicity is traceable throughout the technological advancements of the digital age. Mobile phone is an example. While the land phone confines the communication between two persons to their respective places, the mobile phone transgresses this spatial confinement. More specifically, the nomadic nature of communication achieved a different level through the invention of the cell phones. Also, this is the age where cinema itself can be created through mobile phones.

CINEMATIC LANDSCAPE

It might be because of this inborn urban nature that cinema always has a nostalgic attitude towards the villages. Camera looks at the villages in a nostalgic mood. The ‘beauty’ of a village is being re-presented though the lens of a camera is ‘imaginary’ to a great extent. Because, the village that appears as ‘real’ is mediated through ‘images’: the real is framed in images. Cinematic image of the village, that is, the image of a lost homeland, thus is necessarily an urban image. In other words, the perspective of the camera is an urban perspective. This is clearly visible in the representation of villages in Malayalam cinema. In most of the recent films, villages are depicted almost like ‘wonderlands’. People view them as a tourist view as a spectacle: camera assumes what can be called a ‘tourist eye’. What cinema does is to provide (impose) an indigenous scenic language for the village by the use of long-shots, low speed film stocks and by using filters that increases greenery. i

The recent film *Ordinary* (2012) is an example for this. The film became a success even without a strong story or screenplay, or any sort of an attractive making. The audience’s response after watching the film was interesting, that most of them wanted to visit ‘Gavi’, the village that is being narrated in the film. Reports say that this film enabled Gavi, which was out of the notice of the tourist destinations of a Malayalee, became suddenly an important tourist centre.

Directly or indirectly, city-imges have been depicted in films right from the beginning of Malayalam cinema. Most of the films produced in the first phase of the history revolved around the stories of urban citizens or migrant Malayalees. The history of Malayalam film-making began in Madras-city. Madras was the first city to where Malayalee youth wanted to migrate either in search of jobs or to be a part of the wonder of cinema. Most of the makers of the history of Malayalam cinema were those who reached Madras out of this fascination. For an aspiring film careerist, the AVM studio was really a wonderland. *Vellaripravinte changathi*, a film released in 2011, narrates the story of passion and fascination of the early technicians and artists who came to Madras to accomplish something in cinema but ended up in failures. In this film, there is a scene where an important character astonishingly stares at the revolving sphere of the AVM Studio.

KOCHI: A CINEMATIC CITY

Kerala is not yet an urbanized society, even though the process of urbanization is in full swing in the recent past. When compared to other states in India, Kerala does not have big metropolitan cities. Experience of urban life here was mostly associated with the small towns called *angadi*, *theruvu*, *chanda*; and even now the situation is significantly different. Recently, ‘Kochi’ slowly assumes the image of a big city and this image is being shaped by cinema in a significant manner. By analyzing some of the cinematic images of the recent past, it can be shown how kochi becomes a cinematic city. Also, it can be shown how the cinematic image of kochi becomes an archetype of the emerging, ‘real’ cities in Kerala.

As above discussed, cinema is a product of industrial revolution. So it has a language to depict city as a product of it. Films are very much depended on its landscape, places are framed with cinematic language, and then it becomes a cinematic landscape of that film. It might be ‘Real’ or imagined according to its narration. Landscape as place is often established in the master shot or establishing shot. In cinema landscapes are filmed through different techniques. Usually landscapes are shot with wide lenses, at times supports with panning or tracking. The use of these techniques are to establish and emphasis the landscape of the story in film. There are some peculiar shots like bird’s eye shot and aerial shot. Bird’s eye shot is a view from a great height like a bird’s point of view. Aerial shots are also used in film for establishing landscape which usually takes with a crane or from a helicopter.

A lens has also a major role in film narration, which determines the space of landscape in a shot. A shot from helicopter help to increase the space of landscape, large portion of landscape is filling in that shot. Usually it is impossible to get such kind of views of the lens of human eye, but cinema can display a panoramic view for the spectator, this is one of the specialties of cinema. Some places or landscape have a better look through camera, because all the setting of the frames are aesthetically arranged or its screen presence is very beautiful or camera from certain angle get a wide view, these qualities are making this landscape cinematic. By understanding this by cinema, place especially city town planning is like mis-en-scene of a stage. In another way every town are planned cinematically. They display not in front of spectator-eye but in front of camera eye. The space within the frame can be used metaphorically. The amount of space is permitted within the frame is also important. A tight frame shot generally does not permit much freedom of movement, all setting in the frame inasmuch as balanced. A wide frame shot permits considerable movement with in the frame.

Landscape in a film can be simply a spectacle like something beautiful and visually pleasant. In a master shot, landscape functions as place and spectacle. As spectacle, it can be something fascinating in itself, thereby momentarily satisfying a voyeuristic desire. This can happen when the film maker returns to a pans shot of a landscape during the film. Here, landscape is either a spectacle of beauty or a spectacle because it generates curiosity and interest.ii

Recently, Kochi is being repeatedly projected as an imaginary space that suits our concept of the city which is shaped through the cinematic images. Kochi is becoming a cinematic landscape; in order that Kochi is part of spectacle. Shoot over shoot the same Landscape, different spaces were being generated through camera. This space accomplished new development, as it is changing as film city. As a matter of fact film industry is developing fast in Kochi. Cinema has mystified Kochi in an urban manner. Cinema, thus, shaped our experience of the urban reality, by making the ‘unfamiliar’ familiar. In this sense, the city-scapes were ‘virtual’ and it can be argued that we started dwelling in those virtual landscapes. Malayali mind being lived in this space. The major part of urban experience is of the public domain. In a sense new generation movies shaped this modern urban experience. Let’s discuss the nature of kochi as city in its tradition and also see the effect of visual culture on society trough some examples.

Kochi is one of the three cities on Malabar Coast- the other two being Calicut and Mangalore-traditionally known as places where West Asia, Europe, Africa, South East Asia, and China met. Kochi’s territoriality has two dimensions, one land based, and the other determined by traditional sea routes converging at the city.iii Though historical Kochi is remembered mainly as a centre of spice trade by many, it was also known for its ship building facilities, which the Portuguese turned into an important trade. The traditional spice trade survives; Kochi without the spice trade is no Kochi.iv Kochi is a direct progeny and heir to the mythic epicenter of Kerala society- Cragnore.v Cranganore had to die-as a harbor, a habitat and as the cultural capital of Kerala and Malabar- for Kochi to be born in 1341. People talk about the ‘oceanic convulsions’ that silted up and made Craganore port unusable and created the Vypin Island and natural harbor at Kochi as if the convulsions were the birth pang of a unique city.vi In earlier times it was known as Muzuris and in Tamil as Muchiri. It is not merely a sleepy city to the North of Kochi that has a once glorious past; Cranganore is the mythic capital of mythic Kerala and mythic Malabar. In the mind of many, it is still the first city of Kerala. The Malayali public consciousness and self definition inextricably centre on that lost city.vii

The traditional city, Muziris still lives in the map of the mind of Malayali, over there a modern city is superimposing by cinema. For instance, in one of the new generation movies like *22 Female Kottayam* (2012), there is a dialogue between heroine and her sister. The heroine’s sister lives in Kochi. The explanation that she gives for cutting her hair is “Kochi is not the old Kochi”. Tessa (heroine) lives in Banglore, the city which is known for advanced urban life styles and fashions. Yet, she couldn’t opt for a boy-styled hair-cut. Just with six months in Kochi, her sister could opt for a metro life style, fashioning herself according to the city-image. She is the only girl who dares to comment on the ‘ass’ of a boy (‘nice ass’) whom they happen to meet in a restaurant. Through this comment and dialogues the spectators get the impression that Kochi is far more advanced than Bangalore in terms of fashions and life-styles. Through dialogues and visual presentations, City based Malayalam movies present an imagined city which suits to the image of the accepted cinematic cities. Since Big B Malayalam cinema consciously project Kochi as an emerging city in Kerala through narratives, visuals, dialogue and music.

In *Big B* (2007), another popular Malayalam movie, the hero named Bilal states “Kochi is not the old Kochi, but Bilal is the same”, which is not only a statement but also a claim that Kochi is changed as an urban city. The narration as well as shot designs of this movie resembles the John Singleton’s Hollywood action thriller *Four Brothers.* The narratives of this movie accomplish to superimpose a city which was familiar only through Hollywood and Bollywood movies. This film starts with the brutal murder of Mary teacher; she is a social activist in Kochi. Murder and avenging undead is the usual tale of cities. This film’s dominant perspective is to mystify fort Kochi as an uncanny city. It makes a mystic experience of space. People invest places with meaning memory and desire and also inhabit the fear of obscure labyrinths of Fort Kochi created by cinema. The cinematic language of the movie is so far strange to Malayali. The meaningful silences, dark places are introduced as a new genre in Malayalam films. From then Malayalam cinema started to familiarize low angle shots, slow motion all come in part of the development of thread, earlier these were only part of stylizing scenes, which consciously open up a space of unknown city, is becomes ‘Real’. This cinematic city persistently came out of frames and also entered into frames of films like ‘*Trivandran Lodge*, released in 2012, Kochi is being compared to old Madras. In films like *Stop Violence* (2002), *Best Actor* (2010), *Chotta Mumbai* (2007) etc, the underworld of Kochi is being compared to that of Mumbai. In most of the films released in the last decade, (Black 2004, *Quotation* 2004, *Sagar Alias Jacky* 2009, *Bhagavan* 2009; *Best Actor* 2010, *Black Stallion* 2003, *Anwar* 2010, *24 hours* 2010, *city of god* 2010, *The metro* 2011, *Bachelor Party* 2012, *Asuravithu* 2012) life in the Kochi-underworld is being (re)presented creating an impression that Kochi is a big city in all respect. Through these repeated cinematic representations a ‘new Kochi’ emerges.

The very name of the movie *Chotta Mumbai* itself explicitly states this. The movie entirely talks about Kochi-life and life in the adjacent downtown streets. The first aerial shot captures the landscape of Kochi. After the voice over, the camera shows the celebration of Kochi Carnival. Along with a bike riding competition in the carnival a murder-scene has been narrated. Representation of the underworld has been an invariable part of the narrative technique of the city-based Malayalam movies.

In 1980s and 1990s, Bombay has become almost a synonym for ‘the underworld’ in Malayalam cinema. *Abhimanyu* (1991)*, Adhipan* (1989) *, Shubhayathra*(1990)*, His Highness Abdullah*(1990), *Aryan*(1988),*Aaram thampuran* (1997) are only some of the examples. The movie *Abhimanyu* narrates the frightening face of the Bombay city. It tells the story of an innocent malayali who comes to the city of Bombay in search of livelihood but becomes a *gonda*. *Shubhayathra* narrates the story of the victims of goondaism. *His Highness Abdullah* tells the story of a *gonda* who comes from Bombay to a ‘kovilakam’ to assassinate the royal heir. In most of these films, urban life is characterized in negative terms contrasting it with the ‘innocense’ of the village-life.

The ‘Bombay’ city started fading away from Malayalam cinema once Kochi started to appear as the symbol of the underworld. In recent films, Kochi has almost displaced the old Bombay. Popular malayalam films repeatedly present kochi as a wonderland with all the amusements available in big cities. Recent films like *Chaappa Kurishu* 2011,*Traffic* 2011, *Beautiful* 2011, *Annayum Rasoolum* 2012, *Trivandrum Lodge* 2012, 22 *Female Kottayam* 2012, *Da Thadiya* 2012,*Nattoli Oru Cheriya Meenalla* 2012, *Honey Bee* 2013, *Mumbai Police* 2013, *Abcd* 2013, *Kadal Kadannoru Mattukutty* 2013, are some of the examples. In the movie *Mumbai Police* the three police men were crowned in the name of Mumbai Police. The strategy of portraying the Bombay underworld once existed in either Malayalam or in Hindi is still stereotyped. Here we see the dystopic city is turned as an amusement place. Most importantly, people start looking at Kochi as it is being (re)presented in films. An imaginary space thus becomes a lived space.

Since 1990s Kochi has occupied the space of modern city. Padmarajan’s *Aparan* is a Kochi based movie. The protagonist Vishwanathan (starred by Jayaram) came to Kochi for a job. There he continuously haunted by the shadow of his *aparan* (the other). The other, Uttaman, a criminal in the city unimaginably resembles to Vishwanathan. Finally Vishwam won Uttaman in a fight, Uttaman stabbed to death by his co-*gonda*. Vishwam’s family found the dead body with the abandoned certificates of Vishwom. They misunderstood by the dead body and performed the last ritual for their son. Though Vishwom lost his identify and started to live in the shadow of Uttaman. This might be the first movie occupied the dystopic space of Kochi in Malayalam cinema.

It is being already observed that many of the important western cities, especially Berlin, Los Angels, and Paris, developed by shaping and reshaping themselves according to the cinematic images produced on them. Berlin City is often considered as the first cinematic city. In 1920s and 1930s, Berlin city was repeatedly shot in many fims like *The Symphony of the Great City* (Walter Ruttmann 1927), *Berlin Alexanderplatz* (Piel Jutzi, 1939), Berlin *Express* (Jacques Tourneur) . Afterwards, cities like Paris and Los Angeles started appearing in main stream world cinema. As noted by many, these cities ‘came out of the celluloid’ and became ‘real’; People, mesmerized by the cinematic images, started visiting these cites as ‘tourists’.

Development of tourism is essentially linked to cinema. Cities are primarily business-zones. What cinema did was to link entertainment with business, thus making city a tourism zone. Before Kochi becoming a city, there were several other business-zones in Kerala. Kozhikode can be taken as an example. Even though it has made its appearance in many films, Kozhikode could not shape itself according to the needs of cinema. It still remains like an obstinate elder of a family who is reluctant to part with his old pomp. The film *Usthad hotel* (2012) features Kozhikode city; throughout the film, the crust of the movie is to show the food culture of Kozhikode. The story revolves around ‘*Usthad Hotel’*, a small village-styled hotel run by an old man named ‘Karimka’. Karimka is committed to the Sufi values and not profit-minded. His hotel is well known for the taste and the quality of the food; it is from here that the biriyani to the nearby star hotel is prepared. The film is focused more on the traditional values with virtually no reference to the so called underworld activities which are usually associated with the cinematic representations of the city. Cinema ends with a scene where biriyani is served in the hotel in the background of Sufi music.

In contrast, Kochi-based films articulate a different form of urban reality altogether. Consequently, new Kochi is in the making. In a significant sense, Kochi can be considered as the first cinematic city of Kerala. Shot over and over again, this city has become an ‘image more real than the real’, a hyper-reality. Through cinematic images, Kochi is being transfixed as a desired city, which seems to be just getting out of cinematic frames. People want to visit Kochi, not Kochi as it is, but Kochi as it is being represented in films. Nowadays, visiting cities as part of entertainment is a growing tendency among people. Kochi becoming a city of spectacle, where people come to see and to be seen, here shopping remains a social experience. *Seeing as entertainment* reflects a novel attitude of the people which is being widely promoted by the tourism-industry. Kochi has become a tourist destination even for Keralites, that the ‘local tourists’ want to see the city that they are already acquainted with through the film-images. Entertainment-industry (Shopping malls, Amusement parks, Multiplex theaters etc.) flourish and the events like Kochi carnival, Grand Kerala shopping festival, Kochi-Muziris Biennaleviii etc. attempt to make Kochi fitting into the image of an international city. In fact, Kochi is constantly being reincarnated in the cinematic image.

Reference

1. Baudrillard Jean..*America*. London.Verso:1988.
2. Douglas Keller, *Jean Baudillard from Marxism to Post Modernism and Beyond*. Stratford University press:1989
3. David B. Clarke. *Cinematic City*. Newyork. Routledge: 1997.
4. Lukinbeal Chris and Daniel D.Arreola. *Engaging the Cinematic landscape*. Journal of Cultural Geography:2009.
5. Nandy Ashis. *Time Warps: The insistent politics of silent and evasive pasts*. Delhi. Permanent Black:2002.
6. VenkateswaranC.S. *Cinema Talkies*.D.C books: 2001.

Camera techniques

Engaging Cinematic Landscape, Chris Lukinbeal

Time Warps, Ashis Nandy P 162

Ibid 163

Ibid 172

ibid

Ibid 173

1. The Kochi-Muziris Biennale is an international exhibition of contemporary art being held in Kochi, Kerala. It is the first Biennale being held in India. The exhibition is set in spaces across Kochi, Muziris and surrounding islands.

**“The Gap between Myth and Reality”: A Case Study of Mama Bhagne Paharh**

***Md Intaj Ali,***

Research Scholar

Comparative Literature

University of Hyderabad



The present article is essentially an attempt to rediscover the beauty of *Mama BhagnePaharh*(Mama means-maternal uncle,Bhagne means-nephew and Paharh means rock) and its deplorable condition in the contemporary situations. It is located at Dubrajpur in Birbhum district of West Bengal.It also gives an account of the rocks in terms of their geological features and the flora and fauna in the locality.People have different association with the rock formation; some believe it is the nothing but the God of rocks by naming and associating it as *Pahedeswar.*So it is a conceptualizing stories among the locality as well as the outsiders. *Mama BhagnePaharh* is also called as *Pahedeswar*(The God of the rocks, according to the belief of Santaltribes). Though both the terms have a mythological and historical roots of naming thus so. My intention in this paper is to find out the roots related to these myths that has generated and passed down for a long time among the people. As I am living in the same town the questions of its myth and reality always haunted me to find out the reality of it. As a result of this I tried to write an article on the same topic.

*Mama BhagnePaharh* is associated with mythology and historical incidents. Its historical and mythological reference can be recollected by the people of Dubrajpur Municipal locality through oral tradition. So for its documentation I talked to the local researcher and historian like AnupamDutta,RabindraKabiraj ,Dr. SubrataAdhikari and the Municipal Chairman PiyushPandey.

Dubrajpur is a historical and mythical city, which has a long history to be explored. As far as the etymology of the *Pahedeswer* is concerned, it means the God of the rocks. In this context, AnupamDutta opined that before emerging of Dubrajpur as a city, it was a thick forest area where Santal tribes (1) used to live. They used to worship rocks, as God and the name of their God is ‘*Bongaburu’* that means in saintali language God.*Bonga* means God and *Buru* means rock. So naturally, this *Mama BhagnePaharh* had been the object of worship at once for the Santalpeople.Actually Santals have no written scripture in their religion. Santhals don’t have even any shape of God and do not believe in idol worship like Hindus. Santhals follow the religion based on natural objects.One can find the peculiarity of the Santal tradition especially in their religion which is mostly related to different kind of myths. This *Bongaburu*is also part of myth in Santal tradition. Earlier Dubrajpur area was surrounded by mainly forest. According to the belief of the common people Santals are the real inhabitants of Dubrajpur forest area. They used to live there with comfort and worship this particular rock formation as their God. As they believe that God can exist everywhere whether it is rock, tree or in the sun.But gradually other dominant religious group people are coming to Dubrajpur and take away their natural habitation. So naturally they have to leave the place due to the extreme pressure from the upper caste and dominant religious groups. Recently one temple has been built in a very gorgeous manner. So far as my view is concerned there is nothing such Hindu religious issue is attached with Mama BhagnePaharh. The association with such Hindu religion with Mama BhagnePaharh has no real ground at all. They are trying to make it more religious construction day by day and that is very much shocking fact for the geologists.

In the second half of the eighteenth century a kingnamed RadhanathChakrabarty (2)ruled overthe local area up to Rajnagar.In the beginning he was the owner of that Mama Bhagnearea, located in his kingdom. After that it was given to Swami BhupanandaMaharaj of Dubrajpur Ram Krishna Ashram and finally it was given to the Dubrjpur Municipality for its preservation in the year 1887.The name of the Chairman was ChandiGorai. Even it is very sad to say that it the property of someone by associating the name of RadhanathChakrabarty,Swami BhupanandaMaharaj and Dubrajpur Municipality. In reality it is a natural object and it is a property of nature.



One can see in the *Mama Bhagne* the act of balancing of the two granite rock on the top of the other which was surprising one.Herebhagne is bigger than mama and that too lead to historical story in Dubrajpurarea. According to RabindraKabiraj, once upon a time there was a two group of people in Durajpur namely Mahato (3)and *Nayak*(4). The group of Mahatos areBhagne (Nephew) and *Nayaks* are Mama (maternal uncle) according to relation. They belonged to Maithali*Brahmin.*Though these two groups are relative, but they are always fighting for money, power and fame. Due to all these Mahatos group of people are always winner in case of money , power and fame. So people of Dubrajpur locality are trying to associate this story with this *Mama BhagnePaharh*as *bhagne* is bigger than *mama.*

This place shares some mythical storiestoo i.e. when Rama decided to attack Ravana he found it necessary to throw a bridge across the straits for the conveyance of his troops, he drove in his aerial chariot to the Himalayas, picked up what stones he needed and drove back. As he was passing Dubrajpur*Mama BhagnePaharh* ,his horses took fright and tilted up the chariot and so some stones fell out. These are the stones at *Mama Bhagne*. There is another legend to the effect that they were collected by Viswakarma, at the command of Lord Shiva, to erect in one night, a second Kasi. When he collected the rocks and was about to commence workday dawned and so he left.(O’Malley,125-128)

Another interesting fact we found out was at the base of the rocks there is a temple of Lord Shiva entitled *Pahareswar*.Mama-Bhagne could have been the handiwork of the temperamental Shiva, who, on discovering that his consort, Sati, had immolated herself, did what he does best. Notorious for performing the *tandava* at the drop of a hat, Shiva went on a rampage with Sati on his shoulders. His movements not only fragmented and scattered Sati’s charred body, but also the land, breaking it up into the rocks that now constitute the *Mama BhagnePaharh*. A hot spring appeared on the spot where Sati’s yoni fell. A constant trickle marks the place to this day, signifying her fertility. (<<http://www.telegraphindia.com/1100304/jsp/opinion/story_12174966.jsp>>)



However, all these mythical stories do not provide any real evidence at all. Actually all these are myth, which transformed from one generation to another through oral tradition.According to Dr. SubrtaAdhikari, this formation of rock is a geological process of formation and there is no relation of history and mythology regarding its formation. He explained that it could have been the result of a plain boring volcanic eruption millions of years ago that led to the formation of these oddly-balanced blocks of lava, which got solidified into granite.

Recently Dubrajpur Municipality established a children’s park beside Mama BhagnePaharh to make it more attractive for the tourist and children of the locality *.*Now it is a turn to discuss about its projection in popular culture .Even Satyajit Ray made a film *Abhijan* in 1962 on the setting of *Mama BhagnePaharh*.Ray got involved into the film *Abhijan* when they went to the famous hill-spot Dubrajpur in Birbhum not much away from BolpurShantiniketan. It was then that the looming (almost as a recurring motif) *Mama BhagnePaharh* was assimilated into the films backbone. As a result, we see that the motif of human being with their baggage of sin and adultery will be symbolized into the stone pillar.Moreoverthe rock formation is a thematic motif of the movie Abhijan by Satyajit Ray, where the rocks are seen as symbols of human being carrying its sin accumulated over time. It is also the title for AnupSengupta's Mama Bhagne (2009),starringPrasenjitChatterjee and AnanyaChatterjee.

(<<http://en.wikipedia.org/wiki/Abhijan>>)

It can be hoped that the present article will provide a framework and concern for further surveys for preserving rocks and eventually attracts the attention of the people and the Government to take some necessary steps. As we know, that rocks and hills are natural phenomenon and they have a room of their own. Therefore, we do not have any authority to interrupt their life by destroying them or making habitation by uprooting them. A conscious effort should be taken for preserving the ancient rocks like *Mama BhagnePaharh*, which is one of the tourist spotof Bengal. But unfortunately the Govt. of West Bengal has not been taken any initiative to save such natural beauty which is gradually demolishingby theemergence of local habitation.



In his review of the ‘Rock Sites of Andhra Pradesh’ volume –I published by Society to Save Rocks of Hyderabad Pinaki Das comments that rocks continue to playa role in the economic and social lives of people who live near them. Thus, the rock sites have been treated as "living systems" not merely in the biological/environmental sense of the term but with regard to the human interaction as well.(<<http://saverocks.org/Events.html>>)

It is important to reinforce the fact that rock is not casual decoration; it is part of the archaeological record and it has the potential to illuminate many parts of a culture. It can tell us about belief and ideology, myth and cosmography. Rock can reveal time, place of origin, spheres of influence and aspects of social organization. It is an irreplaceable cultural resource, which deserves our efforts in its protection and preservation.



If adequate funds were available, a greater effort could be constituted to conserve and preserve such natural beauty. However, the unfortunate fact is that we are not getting such funds from the Govt. Moreover, the local municipality is also helpless regarding these critical problems. Day by day local people are making their habitation by removing such rocks as a result the space or the area of *Mama BhagnePaharh* is reducing gradually. Though it is natural that the rocks are silent always and they do not have the power to speak against such activities. Therefore, we need to speak for them by making a society to save rocks with a slogan like ‘conserve rocks to conserve nature’.

We need to build up a society to Save Rocks aiming to preserve and protect the spectacular ancient granite formations of the *Mama BhagnePaharh*, a natural wonder of stony ridges and hillocks shaped into picturesque balancing forms.To prevent the indiscriminate destruction of this natural, historical, and environmental heritage, a group of people, students, environmentalists and teachers should join their hand to preserve it.

Finally, we believe the key to the longevity of the preserve is to keep a steady eye on the preservation of the land and all its attributes. By doing so we can ensure the rocks will remain a natural, scenic, and recreational resource for generations to come.For the people who are interested in artistic adventure, the stunning natural beauty of the area is both iconic and unique and is sure to be inspirational and motivational. Above all, it is our duty to think for its longevity and natural existence without interrupting their life.

Notes

1. The Santal (also spelled as Santhal (formerly also spelt as Sontal), are the largest tribal community in India, who live mainly in the states of Jharkhand, West Bengal, Bihar, Orissa, and Assam.(<<http://en.wikipedia.org/wiki/Santali_people>>)
2. RadhanathChakrabarty, the true founder of the Hetampur Raj family,whose ancestor MuralidharChakravarty, according to tradition, had migrated from his original home in Bankura to Rajnagar in Birbhum in the latter half of the seventeenth century. At that time Rajnagar was the controlling seat of the Muslim zamindari of Birbhum.

(<<http://en.wikipedia.org/wiki/Hetampur>>)

(<http://www.facebook.com/media/set/?set=a.245665515460991.79914.139310402763170>)

1. A Hindu caste or distinctive social group of India.
2. A Hindu caste or distinctive social group of India.

Work Cited

(<[http://en.wikipedia.org/wiki/Abhijan](http://en.wikipedia.org/wiki/Abhijan.html))Accessed on: 4th January, 2012

(<<http://en.wikipedia.org/wiki/Mama_Bhagne>>) Accessed on: 24th March, 2012

O’Malley, L.S.S., ICS, Birbhum, Bengal District Gazetteers, pp. 125-128, first published 1910, 1996 reprint, Government of West Bengal

(<<http://www.telegraphindia.com/1100304/jsp/opinion/story_12174966.jsp>>) March 04 , 2010.Accessed on: 9th March, 2012.

(<<http://saverocks.org/Events.html>>) Accessed on: 12thJune , 2012.

Interview Source

AnupamDutta, a well known creative writer, novelist and dramatist. Personal interview taken by me on 24th April, 2012

Kabiraj, Rabindra,one of the most reputed and most experienced and senior journalist of AnandabazarPatrika.Personal interview taken by me on 25th April, 2012

Pandey, Piyush , Chairman of Dubrajpur Municipality. Personal interview taken by me on 27th April, 2012

Dr. SubrataAdhikari , Assistant Teacher of Geography in SreeSreeSaradaVidyapith, Dubrajpur , Birbhum, Personal interview taken by me on 27th April, 2012

Note- All these interviews are available online in my YouTube channel. One can have a look at the following link-- <http://www.youtube.com/user/9233024413?feature=mhee>.Moreover all the photographs are clicked by me.

**Social Integration through Human Upliftment by Swami Vivekananda’s Thought**

***Manoj Kumar Yadav***

Research Scholar,

Faculty of Education

BHU, Varanasi

**Introduction**

Swami Vivekananda was the spiritual leader of modern India and rejuvenator of Hinduism. During his short span of thirty-nine years, he changed the course of national history. He worked to instill new ideals that would eradicate many of India’s social ills. When Hinduism was criticized as archaic and socially irrelevant, Swami ji showed Indian and world that this ancient religion and philosophy is still consistent with the highest human ethics. In all his teachings and writings, Swami ji proclaimed the universality of Vedanta. His message was basically spiritual and philosophical, but had deep practical and social implications. Swami ji ethics are closely related to every movement of life; and social in the sense that its principles can be the foundation of every social system which leads to social integration and society development. According to him, human upliftment and principles of social ethics are key to building up strong nations.

Social integration is not a perfect assimilation. No society is ever perfectly integrated, but some amount of integration is a requisite for the very existence of the society and thus it experiences all through its life span. The integration of society does not entail the loss of social identity by any of its cultural subgroups.

**Need of Human Upliftment for Social Integration**

Swami Vivekananda loved everyone and wished their happiness, welfare and upliftment, irrespective of caste or creed. He looked upon whole society as his sisters and brothers without considering whether they were Brahmin, Kshatriya, Vaishva or Shudra. He always felt that a fully integrated society will not practically emerge in India unless and until the condition of poor and miserable people is improved. According to him, upliftment is the basic pre-condition for building up great India. He said that no amount of politics would be of any avail until the masses in India are once more well educated, well fed, and well cared for.

Further he said that human upliftment is necessary for social integration. We will, have to develop the personality, thinking, character and behaviour of the whole society. He proclaimed, “Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature: External and Internal.”

Since social integration is in essence spiritual it is therefore free from all narrow ideas of regionalism, provincialism, casteism, inordinate attachment to a particular language or other forms of fanaticism.

**A Multi-dimensional development of human personality**

For human upliftment social, mental, physical and spiritual dimension of human personality should be looked after, because holistic upliftment of human being is necessary condition for healthy society. Growth at these dimensions leads human beings towards a scenario of social integration.

**1. Physical Dimension**

Healthy mind dwells in healthy body. Swami ji also emphasized it and made an urge for sound physical health. He always used to say that, “strength is life and weakness is death”. He not only emphasized on physical strength but also on mental and spiritual strength. Physical health is a prerequisite to all others. According to him, self- confidence is most important in human life and this confidence is achieved by physical health. Due to physical weakness, we lose our confidence. He called upon youth,-“Make your nerves strong. What we want is muscles of iron and nerves of steel. We have wept long enough. No more weeping, but stand on your feet and be men. First of all, our young men must be strong. Religion will come afterwards. Be strong my young friends; that is my advice to you. You will be nearer to heaven through football than through the study of the Gita. When muscles and nerves will be strong, you would well understand the message of Gita and you could follow these messages in your life”.

**2. Mental Dimension**

Beside the physical strength he also emphasized on mental strength. To develop mental strength, he emphasized on ‘Brahmcharya’ as a way of life. It is a way of attaining mental discipline by sense control. To him every instinct should be changed in life force then mind will be strong and will not be diverted through Vasana and mental infirmity. It can be done only by Bramhacharya and Sadhana.

**3. Spiritual Dimension**

Swami Vivekananda said that the way to develop the spiritual dimension of human is to know ourselves and to have faith in ourselves. Faith in us will do everything. The old religions said that he was an atheist who did not believe in God. The new Vedanta teaches that he is an atheist who does not believe in himself. But that faith is not selfish faith in the little, limited self but in the universal self. The self that is in me, that is in you, that is in all.

In our society people of various languages, groups, religions and sub-cultures are living together. But according to Swami Vivekananda, to the Indian mind there is nothing higher than religious ideals. The Indian mind is first religious then everything else. Yet, the religion which swami ji preached was universal in its sprit, comprehensive in its scope and practical and concrete in its application. Religion alone can secure deeper integration for a society. The religion of universality and spiritual brotherhood, including men of all faiths, affirms the unity of existence. The fundamental oneness of reality is the essence of religion. It also asserts the divinity of man in his essence.

The central ideal of Vedanta is oneness. There are no two in anything, no two lives. There is one life, one world, one existence, everything is that one. The difference is in degree and not in kind. It is the same life that pulsates through all being from Brahma to the amoeba; the difference is only in the degree of manifestation. We must not look on with contempt on others but we should respect them. We all are moving towards the same goal. We should help others to reach the goal, and never do anything that may hurt them or obstruct them. Knowledge of self and seeing God in all human beings is true spirituality.

**4. Social Dimension**

According to Swami ji, if we want to get real spiritual power, we have to dedicate ourselves in the service of mankind. His passion for betterment of humanity came from a deeper layer of awareness of the essential oneness of human kind. Ordinary people see only differences in everywhere. They divide humanity into so many races, so many religion and linguistic communities, so many castes, political parties and so on. Swami ji vision cut through all these barriers by the service of mankind. He saw unity everywhere and wherever possible he strived to create unity by breaking down barriers, by building bridges, by cleaning the clouds of misunderstanding and suspicion, by strengthening the feeling of love and trust. He always emphasized to worship the living God. He urged to visualize God everywhere, in the young and the old, in the sinner and the saint, in the Brahmin and the pariahs, especially the poor, the sick, the ignorant, the destitute, and the downtrodden, for the God in them wants our worship, our care and service. The Vedanta says, serve them, worship them and that will be serving and worshipping the living God, the omnipresent god. He said, he who sees Shiva in the poor, in the weak, and in the diseased, really worship Shiva, and if sees Shiva only in the image, his worship is but preliminary.

**Role of Social Ethics in a Social Integration**

Social ethics can be understood in the framework of Liberty, Equality and Fraternity.

**Liberty:** Swami ji puts great emphasis on liberty as a basic principle of social integration. To him: ‘Liberty’ is the first condition of growth. Liberty in social matters would release the power of the people and help society in advance into new level of growth.

**Equality:** Much like the idea of liberty Swami ji believe in equality. Equality is absolute sameness or oneness in the Advaitic sense of final realization, and this should be reflected in social equality. All ideas of equality will leads to brotherhood.

**Fraternity:** Fraternity is another principle of social integration. It means the state or feeling of friendship and mutual support with a group oriented towards a common purpose that can be religious, social, national, financial, or the like. The best fraternity is the fraternity of the whole humankind, as it bonds all people and shifts the emphasis from God or society, or nation, or money to human being.

Swami ji ideals of seva is in tune with highest social ethics and with the metaphysical ideal of oneness, which is expressed through liberty, equality, and fraternity, the basic concept of social integration of modern society.

**Conclusion:**

If we want to integrate our society, we should try to uplift our humanity and social ethics. Humanity is uplifted by physical, mental, spiritual, and social transformation and social ethics are uplifted in the framework of liberty, equality and fraternity. According to swami Vivekananda, healthy people will lead towards civilized society which again will lead to strong nation. For social integration, human upliftment is the basic step. Communalism, regionalism, and casteism are the main barriers of the social integration. If the spiritual dimension of the society will developed, people will understand the real meaning of religion. On the other hand, with the development of social dimension of human personality, the felling of brotherhood will increase leading to social unity. If we see thoughts of Vivekananda about social integration in modern perspectives, his thoughts are totally relevant. Looking into the strength of his thoughts, Tagore once said, “If you want to know about India, you first know about Vivekananda.”

**References:**

1. Chaudhari, Asim (2000), Swami Vivekananda in Chicago, 1st ed., Swami Mumukshananda, Advait Ashram, Mayawati, Calcutta.

2. Chatterjee, Dr. Satish Chandra (1963), Vivekananda’s neo-vedantism and its practical application, Vivekananda centenary memorial volume.

3. Mumukshananda, Swami (1995), Vivekananda-the great spiritual leader. 1st ed./ Advait Ashram, Mayavati, pithoragarh , Himalayas.

4. Nilkhilananda, Swami,(1984), Vivekananda: The Yogas and other Works, Ramakrishna Vivekananda Centre, New York.

11. Prabhananda, Swami (2003). “Profiles of famous educators: Swami Vivekananda”, Prospects (Netherlands: Springer) XXXIII (2): 231–245.

5. [*"Swami Vivekananda: Life and Teachings"*](http://www.belurmath.org/swamivivekananda.htm)*. Belur Math*. Retrieved 30 March 2012.

6. Tagore, Letters from Russia, translated from Bengali by Sasadhar Sinha (Calcutta: Visva-bharati, 1960), p. 108.10. Tapasyananda, S. The Philosophy and Religious , Lectures of Swami Vivekanada, Trio Process, Kolkata, India, 1947.

7. The Complete work of Swami Vivekananda, vol. IV, V, VI, and IX, Calcutta: Advaita Ashrama, Calcutta.

*8. Vivekananda, Swami (1996). Swami Lokeswarananda, ed.* My India: The India eternal *(1st ed. ed.). Calcutta: Ramakrishna Mission Institute of Culture. pp. 1–2.* [*ISBN*](http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number)[*81-85843-51-1*](http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/81-85843-51-1).

**The Dalai Lama’s Views on Religion, Peace and Environmental Protection-Some Reflections**

**Dr. Malvika Ranjan**

Associate Professor

Dept. of History

BHU

“For as long as space endures.

And for as long as living beings remain,

Until then may I too abide,

To dispel the misery of the world.”

These were concluding lines spoken by His Holiness The Dalai Lama on the occasion of receiving the Noble Peace Prize in 1989 at Oslow, Norway . Today,he is forging ahead and transforming lives with this mission

His Holiness , the 14th the Dalai Lama has been recognised the world over as one of the most revered and respected spiritual teachers. Amongst the various honours bestowed upon him, lies the prestigious Ramon Magsaysay awarded to him in the year1959. He has championed the cause of Tibet , and has religiously engaged himself in spreading the message of peace , harmony and environmental protection. .

The 14th Dalai Lama has been very vocal about the role of religion in shaping the society. He firmly believes that all religious streams despite their fundamental differences have one aim , i.e. human improvement , love, respect for others, sharing other people’s suffering and in pursuance of this aim, truly religious individuals are coming forward to support each other. He said -“ Throughout the various religious systems followers are assuming a salutary attitude toward their fellow humans-our brothers and sisters- and implementing this good motivation in the service of human society. This has been demonstrated by a great many believers in Christianity throughout history, many have sacrificed their lives for the benefit of humankind. This is true implementation of compassion. When we Tibetans were passing through a difficult period , Christian communities from all over the world took it upon themselves to share our suffering and rushed to our help without regard for racial , cultural , religious or philosophical differences , they regarded us real inspiration and recognition of the value of love 1.

The Dalai Lama has adopted a liberal approach and seeking approach towards all religions . He has sought every occasion to align with other religious groups and imbibe their philosophical ideas and practices as he proclaimed-

“ I have taken every occasion to meet with the Christian monks- Catholic and Protestant- as well as Muslims and Jews and of course in India, many Hindus. We meet , pray together meditate together and discuss their philosophical ideas, their way of approach, their techniques. I take great interest in Christian practices, what we can learn and copy from their system. Similarly in Buddhist theory there may be points such as meditative techniques which can be practiced in the Christian Church.” 2 However regarding the distinctiveness of Buddhism he clearly observed -

“Other religious traditions possess many good instructions for cultivating love and compassion, but no other religious tradition explains that things lack intrinsic existence and that everything is dependent on something else. Only the Buddhist tradition explains a state of liberation that is achieved by realizing emptiness, the real nature of all phenomenon..Therefore , only the Buddha, Dharma, and Spiritual Community , or the three Jewels, are the infallible objects of refuge for those desiring liberation or nirvana.3

On several occasions, The Dalai Lama has voiced his opinion about the role of religious leaders in minimizing conflicts. The religious leaders can have a positive influence over the masses and can guide them to resolve conflicts . Highlighting this issue he said-

“Politicians and world leaders are trying their best to achieve arms control and so forth, and this is very useful. At the same time, we who have certain beliefs have a duty and responsibility our own bad thoughts . This is the real disarmament, our own arms control. With inner peace and full control of bad thoughts, external control is not particularly significant. Without inner control, no matter what steps are taken, external efforts will not make much difference. Therefore under the present circumstances, we in the religious community have a special responsibility to all humanity. – a universal responsibility 4

Speculating about the basic reason behind conflicts , The Dalai Lama concluded that the conflicts in this world arose due to dilemma and conflict within human beings themselves. In other words an unhappy and a puzzled mind would spread unhappiness around. He said-“ “World peace comes automatically through inner peace If , inside you , you are full of hatred , suspicion and distrust, it is impossible to create outer peace . So peace must come from inside.5  When there is internal conflict , often one tends to seek the wrong path and becomes destructive. However it is one’s value system which prevents an individual from going astray. According to Dalai Lama, Religion is a harbinger of human values and can come to the rescue of individuals .He viewed that there are ways to develop inner values-

“One is theistic religion- the concept of God, which is very powerful to increase love and compassion….Then there are nontheistic religious traditions like Buddhism and Jainism . They follow the law of causality, so there is no god-no concept of god or creator. According to that , if you help or do things for another person, you get benefits. If you harm another person, you get negative consequences. That approach is also very helpful to increase a sense of concern of others’ well- being.”6

Regarding synthesis of all religions, he observed, ‘Forming a new world religion is very difficult and not particularly desirable.. However in that love is essential to all religions, one could speak of the universal religion of love. As for the techniques and methods for developing love as well for achieving salvation or permanent liberation, there are many differences between religions Thus , I do not think we could make one philosophy or religion. Further, I think that differences in faith are useful. There is a richness in the fact that there are so many different presentations of the way. Given that there are so many different types of people with various predispositions and inclinations., this is very helpful. At the same time, the motivation of all religious practice is similar- love sincerity and contentment. The teachings of tolerance, love and compassion are the same. A basic goal is the benefit of humankind-each type of system seeking in its own unique ways to improve human beings. If we put too much emphasis on our own philosophy, religion or theory , are too attached to it and try to impose it on other people, it makes trouble. Basically, all the great teachers such as Gautama Buddha, Jesus Christ or Mohammad founded their new teachings with a motivation of helping their fellow humans. They did not mean to gain anything for themselves nor to create more trouble or unrest in the world. Most important is that we respect each other and learn from each other those things that will enrich our own practice. 7 In this way, Dalai Lama has been vehemently supporting the idea of adopting a liberal attitude towards all religions .

Dalai Lama has been doing commendable work in the field of environmental awareness. In the year 2007 ,His Holiness the XIV Dalai Lama released his collected statements made on the environment on different occasions from 1986 through 2006 where he expressed his concern for environmental crises. On The World environment Day on June5, 1986, he said-

“Exploration of outer space takes place at the same time as the earth’s own oceans, seas, and freshwater areas grow increasingly polluted, and their life forms are largely unknown or misunderstood

Many of the earth’s habitats, animals, plants, insects, and even micro-organisms that we know of as rare or endangered, may not be known at all by future generations. We have the capacity, and the responsibility. We must act before it is too late8

Highlighting the importance of Non violence , he stated-“As a boy studying Buddhism, I was taught the importance of a caring attitude toward the environment. Our practice of non-violence applies not just to human beings but to all sentient beings – any living thing that has a mind. Where there is a mind, there are feelings such as pain, pleasure, and joy. No sentient being wants pain: all wants happiness instead. I believe that all sentient beings share those feelings at some basic level”9

Regarding the importance of tree plantation and its protection, Dalai Lama observed-

I have remarked on several occasions about the importance of tree planting both in India, our current home, and in Tibet as well. Today, as a symbolic gesture we are having a tree planting ceremony here in the settlement. Fortunately, the movement towards a deeper commitment to environmental protection through planting new trees and taking care of the existing ones, is rapidly increasing all over the world. At the global level, trees and forests are closely linked with weather patterns and also the maintenance of a crucial balance in nature. Hence, the task of environment protection is a universal responsibility of all of us. I think that is extremely important for the Tibetans living in the settlements to not only take a keen interest in the cause of environmental protection, but also to implement this ideal in action by planting new trees. In this way, we will be making an important gesture to the world in demonstrating our global concern and at the same time making our own little but significant, contribution to the cause.10

Dalai Lama has thus been involved in spiritually uplifting the lives of human beings and engaging in activities of social relevance with utmost fervour . His message for the masses is expressed in the following lines-

“We must work together. Humanity needs no genuine cooperation. The foundation for the development of good relations with one another is altruism, compassion, and forgiveness. For small arguments to remain limited, in the human circle the best method is forgiveness. Then no conflict, no matter how serious will go beyond the bounds of what is truly human.11

References-

1 Hopkins Jeffery(ed).,2010, ‘.Kindness , Clarity and Insight, Motilal Benarsidas Publisher-Delhi,pg 46

2 Piburn Sidney(ed).,2002., ‘The Dalai Lama-A Policy of Kindness’Snow Line Publications, New York, Pg 56

3 Lopez Donald(ed) 1998, ‘ The joy of living and dying in peace by His Holiness The Dalai Lama of Tibet’, Introduction,’Harper Cllin Publishers, London.

4 Hopkins Jeffery(ed).,2010, ‘.Kindness , Clarity and Insight, Motilal Benarsidas Publisher-Delhi, Pg 48

5 Singh Renuka(ed).,2013.,’Boundless as the sky’ .,Penguin Ananda,, Pg 166

6 Ibid

7 Piburn Sidney(ed).,2002., ‘The Dalai Lama-A Policy of Kindness’Snow Line Publications, New York, Pg57.

8 ‘ His Holiness the XIV Dalai Lama on Environment, Collected Statements’ ,2007, Published by Environment and Development Desk Department of Information and International Relations (DIIR) Central Tibetan Administration Dharamsala,Pg1

9 ‘ His Holiness the XIV Dalai Lama on Environment, Collected Statements’ ,2007, Published by Environment and Development Desk Department of Information and International Relations (DIIR) Central Tibetan Administration Dharamsala Pg15

10 His Holiness the XIV Dalai Lama on Environment, Collected Statements’ ,2007, Published by Environment and Development Desk Department of Information and International Relations (DIIR) Central Tibetan Administration Dharamsala ,Pg20-,22

11. Piburn Sidney(ed).,2002., ‘The Dalai Lama-A Policy of Kindness’Snow Line Publications, New York , Pg 113